Contents

২

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

تاريخ الأنبياء والرسل ﷺ
(الجزء الثاني)
تأليف: د. محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৩১
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৩২ হিঃ
ডিসেম্বর ২০১০ খৃঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য
১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

NOBIDER KAHINI-2 (The lives of the prophets-2) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365, 760525. Fixed Price: US Doller: $3 (three) only.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইস্রাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের '১ম সংস্করণ' এবং অক্টোবর'১০-য়ে '২য় সংস্করণ' বের হবার পর বাকী ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড সত্বর বের হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র

(المحتويات)

Contents

Contents

Contents

Contents

১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত্ব ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।[১] কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ’ল এটি। যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়। ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার মধ্যে এবং তাঁর কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে। সর্বোপরি শাসক সম্রাট ফেরাঊন ও তার ক্বিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু অভিবাসী বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মূসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাঊনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম বাকভঙ্গীতে। মোটকথা কুরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা‘আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ’ল, এলাহী কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাসূল দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা

১. *মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), ১/১৩৬ পৃঃ।*

(আলাইহিমুস সালাম) সবাই ছিলেন বনু ইস্রাঈল-এর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী। মূসা *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন এঁদের সবার মূল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, কওমে মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ৪৪টি সূরায় ৫৩২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

ফেরাঊনের পরিচয় :

'ফেরাঊন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ'ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID), স্ফিংক্স (SPHINX) প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ'ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাঊন'-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল 'রেমেসিস-২' (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিস্কৃত হয়। সিনাই

২. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৪৯-৭৪=২৬, ৮৭, ৯২-৯৮=৭, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬-২৪৮; (২) আলে-ইমরান ৩/১১, ৮৪; (৩) নিসা ৪/৪৭, ১৫৩-১৫৫, ১৬৪; (৪) মায়েদাহ ৫/২০-২৬=৭; (৫) আন'আম ৬/৮৪, ৯১, ১৫৪; (৬) আ'রাফ ৭/১০৩-১৬২=৬০, ১৭১, ১৭৫-১৭৬; (৭) আনফাল ৮/৫২-৫৪=৩; (৮) ইউনুস ১০/৭৫-৯০=১৬; (৯) হূদ ১১/৯৬-১০১=৬, ১১০; (১০) ইবরাহীম ১৪/৫-৮=৪; (১১) ইসরা ১৭/২, ১০১-১০৪=৪; (১২) কাহফ ১৮/৬০-৮২=২৩; (১৩) মারিয়াম ১৯/৫১-৫৩=৩; (১৪) ত্বোয়াহা ২০/৯-৯৯=৯১; (১৫) আম্বিয়া ২১/৪৮-৫০=৩; (১৬) হজ্জ ২২/৪৪; (১৭) মুমিনূন ২৩/৪৫-৪৯=৫; (১৮) ফুরক্বান ২৫/৩৫-৩৬; (১৯) শো'আরা ২৬/১০-৬৮=৫৯; (২০) নমল ২৭/৭-১৪=৮; (২১) ক্বাছাছ ২৮/৩-৪৮=৪৬, ৭৬-৮৩=৮; (২২) আনক্বাবূত ২৯/৩৯-৪০; (২৩) সাজদাহ ৩২/২৩-২৪; (২৪) আহযাব ৩৩/৭, ৬৯; (২৫) ছাফফাত ৩৭/১১৪-১২২=৯; (২৬) ছোয়াদ ৩৮/১২; (২৭) গাফের/মুমিন ৪০/২৩-৫৪=৩২; (২৮) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৫; (২৯) শূরা ৪২/১৩ (৩০) যুখরুফ ৪৩/৪৬-৫৬=১১; (৩১) দুখান ৪৪/১৭-৩১=১৫; (৩২) আহক্বাফ ৪৬/১২, ৩০; (৩৩) ক্বাফ ৫০/১৩; (৩৪) নজম ৫৩/৩৬; (৩৫) ছফ ৬১/৫ (৩৬) যারিয়াত ৫১/৩৮-৪০=৩; (৩৭) ক্বামার ৫৪/৪১-৪২; (৩৮) তাহরীম ৬৬/১১; (৩৯) হা-কক্বাহ ৬৯/৯; (৪০) মুযযাম্মিল ৭৩/১৫-১৬; (৪১) নাযি'আত ৭৯/১৫-২৬=১২; (৪২) বুরূজ ৮৫/১৮; (৪৩) আ'লা ৮৭/১৯ (৪৪) ফাজর ৮৯/১০। সর্বমোট = ৫৩২টি।*

উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ‘জাবালে ফেরাঊন’ নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, ‘থেব্স’ (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাঊন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি।[৩] উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, ‘আজকে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম। যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হ’তে পার’... *(ইউনুস ১০/৯২)*। বস্তুতঃ ফেরাঊনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে।

মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- (القصص ٣-٤)-

‘আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য’। ‘নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩-৪)*।

পবিত্র কুরআনে ফেরাঊনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাঊনী

---

৩. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ:; তানত্বাভী জওহারী (মৃ: ১৯৪০খৃ:), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃ:।

যুলুমের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, যুগে যুগে ফেরাঊনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের উপরে তাদের যুলুমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ হবে। যদিও পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে। কোন যুগই ফেরাঊন থেকে খালি থাকবে না। তাই ফেরাঊন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই নরাধম সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা করেছেন। যাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা সাবধান হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। মুসলিম নামধারী বর্তমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর 'ময়দানে রেমেসীস'-এর প্রধান ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি খাড়া করেছেন'।[৪]

বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস :

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'। হিব্রু ভাষায় 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আল্লাহ্‌র দাস'। সে হিসাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরগণকে 'বনু ইস্রাঈল' বলা হয়। কুরআনে তাদেরকে 'বনু ইস্রাঈল' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে 'আল্লাহ্‌র দাস' হবার কথাটি তাদের বারবার স্মরণে আসে।

ইয়াকূব (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান ছিল কেন'আনে, যা বর্তমান ফিলিস্তীন এলাকায় অবস্থিত। তখনকার সময় ফিলিস্তীন ও সিরিয়া মিলিতভাবে শাম দেশ ছিল। বলা চলে যে, প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত প্রায় সকল নবীর আবাসস্থল ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলে। যার গোটা অঞ্চলকে এখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলা হচ্ছে। ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী ও পরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কেন'আন অঞ্চলেও চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর আমন্ত্রণে পিতা ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্রগণ ও পরিবারবর্গ সহ হিজরত করে মিসরে চলে যান। ক্রমে তাঁরা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন ও সুখে-শান্তি তে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তারীখুল আম্বিয়া-র লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে কোথাও ফেরাঊনের নাম উল্লেখ না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় ফেরাঊনদের হটিয়ে সেখানে 'হাকসূস' (ملوك الهكسوس)

---

৪. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত: মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭।

রাজাদের রাজত্ব কায়েম হয়। যারা দু’শো বছর রাজত্ব করেন এবং যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় দু’হাযার বছর আগের ঘটনা।[৫] অতঃপর মিসর পুনরায় ফেরাঊনদের অধিকারে ফিরে আসে। ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূনের সময় যে নিপীড়ক ফেরাঊন শাসন ক্ষমতায় ছিল তার নাম ছিল রেমেসীস-২। অতঃপর তার পুত্র মারনেপতাহ-এর সময় সাগরডুবির ঘটনা ঘটে এবং সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল সমাধি হয়।

‘ফেরাঊন’ ছিল মিসরের ক্বিবতী বংশীয় শাসকদের উপাধি। ক্বিবতীরা ছিল মিসরের আদি বাসিন্দা। এক্ষণে তারা সম্রাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে আগত সুখী-স্বচ্ছল বনু ইস্রাঈলদের হিংসা করতে থাকে। ক্রমে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াকূবের মিসরে আগমন থেকে মূসার সাথে মিসর থেকে বিদায়কালে প্রায় চারশত বছর সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল কাছাকাছি প্রায় তিন মিলিয়ন[৬] এবং এ সময় তারা ছিল মিসরের মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ’।[৭] তবে এগুলি সবই ইস্রাঈলীদের কাল্পনিক হিসাব মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই’। বরং কুরআন বলছে إِنَّ هَؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ- (الشعراء ٥٤)- ‘নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি দল’ *(শো‘আরা ২৬/৫৪)*। এই বহিরাগত নবী বংশ ও ক্ষুদ্র দলের সুনাম-সুখ্যাতিই ছিল সংখ্যায় বড় ও শাসকদল ক্বিবতীদের হিংসার কারণ। এরপর জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফেরাঊনকে ভীত ও ক্ষিপ্ত করে তোলে।

মূসা (আঃ)-এর পরিচয় :

موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام-

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন ‘আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)।[৮] অর্থাৎ মূসা হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম

৫. তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ১২৪।
৬. তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০।
৭. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০ পৃঃ।
৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।

অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'ইমরান' ও মাতার নাম ছিল 'ইউহানিব'। তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৯] উল্লেখ্য যে, মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল 'ইমরান'। যিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা। মূসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(সাজদাহ ৩২/২৩, ছফ ৬১/৬)*। মূসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাঊনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাঊনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাঊন ডুবে মরে এবং বনু ইস্রাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় মূসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর।[১০] তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।[১১] সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে 'তুবা' (طُوًى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ'তে প্রস্থান এবং ফেরাঊনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন'আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে

---

৯. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, ত্বোয়াহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১।
১০. রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/১২০, ৩য় মুদ্রণ ২০০১।
১১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৬।

অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল ঢিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[১২] উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের[১৩] প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ। এজন্য ইবরাহীমকে ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীদের পিতা বলা হয়।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনী :

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ’তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে’।[১৪]

মিসর সম্রাট ফেরাঊন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় বনু ইস্রাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে। বৃদ্ধরাও মারা যাবে। মহিলারা সব

---

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

১৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*

১৪. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।*

দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। অথচ বনু ইস্রাঈলগণ ছিল মিসরের শাসক শ্রেণী এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি। এই দূরদর্শী কপট পরিকল্পনা নিয়ে ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীগণ সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জাল্লাদ নিয়োগ করে। মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বনু ইস্রাঈলের গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করত এবং প্রসবের দিন হাযির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে। ছেলে হ'লে পুরুষ জাল্লাদকে খবর দিত। সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে যবহ করে ফেলে রেখে চলে যেত।[১৫] এভাবে বনু ইস্রাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, শাসকদল ক্বিবতীরা ফেরাঊনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফেরাঊন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারূণের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়।[১৬] ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে 'ইলহাম' করেন। যেমন আল্লাহ পরবর্তীতে মূসাকে বলেন,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي- (طه ٣٧-٣٩)-

'আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম'। 'যখন আমরা তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়'। '(এই মর্মে যে,) তোমার নবজাত সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও'। 'অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফেরাঊন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ'তে বিশেষ মহব্বত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৭-৩৯)*। বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

---

১৫. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৮, ৯।*
১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৩ পৃঃ।*

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ- (القصص ٧)-

‘আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭)*। মূলতঃ শেষের দু’টি ওয়াদাই তাঁর মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- (القصص ١٠)-

‘মূসা জননীর অন্তর (কেবলি মূসার চিন্তায়) বিভোর হয়ে পড়ল। যদি আমরা তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহ’লে সে মূসার (জন্য অস্থিরতার) বিষয়টি প্রকাশ করেই ফেলত। (আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম এ কারণে যে) সে যেন আল্লাহ্র উপরে প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকে’ *(ক্বাছাছ ২৮/১০)*।

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ’লেন :

ফেরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।[১৭] অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে *(ক্বাছাছ ২৮/১১)* সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*। এক সময় তা ফেরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (آسية) বিনতে মুযাহিম ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য

১৭. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৭ আয়াত।*

স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফেরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৯)*। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফেরাঊনের হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃ এটাও ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- (القصص ٩)-

‘এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি’। আল্লাহ বলেন, ‘অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৯)*। মূসা এক্ষণে ফেরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ’ল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ- (القصص ١٢)- ‘আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম’ *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, ‘আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী’? *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ’ল। মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হ’তে থাকল।[১৮] এভাবে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ’তে মা-বাবা মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হ’ল। অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ’তে তারা মুক্ত হ’লেন। সাথে সাথে সম্রাট

---

১৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; ঐ, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, নাসাঈ, ‘হাদীছুল ফুতূন’।

নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই ফেরাঊনী কৌশলের উপরে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হ’ল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- (النمل ٥٠)-
‘তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা (আমাদের কৌশল) বুঝতে পারেনি’ *(নমল ২৭/৫০)*।

যৌবনে মূসা :

দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাঊন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হ’তে থাকেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- (القصص ١٤)-
‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হ’লেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৪)*।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাঊনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাঊন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)*। আর সেটি হ’ল বনু ইস্রাঈল। প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। এভাবে একদিকে ফেরাঊন অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে ‘সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি’ ভেবে সারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে ‘একমাত্র উপাস্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)* مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِىْ- (القصص ٣٨)- বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। অন্যদিকে মযলূম বনু ইস্রাঈলদের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহ মযলূমদের ডাকে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমরা

চাইলাম তাদের উপরে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে’। ‘এবং আমরা চাইলাম তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫-৬)*।

যুবক মূসা খুনী হ’লেন :

মূসার হৃদয় মযলূমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওদিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। মূসা একদিন দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। যাদের একজন যালেম সম্রাটের ক্বিবতী বংশের এবং অন্যজন মযলূম বনু ইস্রাঈলের। মূসা তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই অক্কা পেল। মূসা দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- (القصص ١٥-١٦)-

‘একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল দিবানিদ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু’জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল শত্রুদলের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, ‘নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ। সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু’। ‘হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৫-১৬)*।

পরের দিন ‘জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মূসাকে বলল, হে মূসা! আমি তোমার শুভাকাংখী। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাও। কেননা সম্রাটের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

করছে’ *(ক্বাছাছ ২৮/২০)*। এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ- (القصص ٢١-٢٢)-

‘অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর’। ‘এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/২১-২২)*।

আসলে আল্লাহ চাচ্ছিলেন, ফেরাউনের রাজপ্রাসাদ থেকে মূসাকে বের করে নিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত করতে। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে লালিত-পালিত করে তাওহীদের বাস্তব শিক্ষায় আগাম পরিপক্ক করে নিতে চাইলেন।

মূসার পরীক্ষা সমূহ :

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্তুতঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ‘আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথাঃ (১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা।

অতঃপর নবুঅত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ (১) জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফেরাউনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির পরীক্ষা (৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

মূসার জন্ম হয়েছিল তাঁর কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে। আল্লাহ তাঁকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাঁচিয়ে নেন। অতঃপর তাঁর জানী দুশমনের ঘরেই তাঁকে নিরাপদে ও সসম্মানে

লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত। অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাঊন তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে চলছিল। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত

অতঃপর যৌবনকালে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা হ'ল- হিজরতের পরীক্ষা। মূলতঃ এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা। শেষনবী সহ অন্যান্য নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়। অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাঊনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্র উপরে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন 'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/২২)*, অতএব তাঁকে মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে নিজেকে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো'আন (معان) সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরেই 'মাদইয়ান' অবস্থিত।

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন

মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে

গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ’ (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। ‘অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন’ (তারপর মেয়ে দু’টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)। মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- (القصص ٢٤)-

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*। হঠাৎ দেখা গেল যে ‘বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে’। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, ‘আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)*।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু‘আয়েব (আঃ)। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু‘আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، ‘ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ’। ‘এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। ‘তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে’। ‘মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ’ল। দু’টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)*। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের

মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ'তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'।[১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرسُ الناس ثلاثةٌ: صاحبُ يوسفَ حين قال لإمرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا، وصاحبةُ موسى حين قالت يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوىُّ الامين، وابوبكر الصديق حين استخلف عمرَ رضى الله عنه-

'সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন: ১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে' ২- মূসার স্ত্রী, যখন (বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা, এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ'তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' এবং ৩- আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন'।[২০]

৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখন যাবার পালা। পুনরায় স্বদেশে ফেরা। দুরু দুরু বক্ষ। ভীত-সন্ত্রস্ত্র মন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও যেতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিসরে। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ'লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ'ল তৃতীয় পরীক্ষার পালা।

১৯. বুখারী হা/২৪৮৭ 'সাক্ষ্য সমূহ' অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।
২০. মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।

উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু’টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে পান এক পাল দুম্বা। এছাড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে।

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ’লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ’ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচণ্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ’ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে পড়ল। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব’ *(ত্বোয়াহা ২০/১০)*। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২১] পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তাঁর চার পাশ থেকে। মনে হ’ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে ‘তুবা’ (طُوَى) উপত্যকায় দণ্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى- (طه ١١-١٢)-

২১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।*

‘অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!’ ‘আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ’ *(ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)*। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয।[২২] অতঃপর আল্লাহ বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى- (طه ١٣-١٦)-

‘আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক’। ‘নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর’। ‘ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’। ‘সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে (ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ’তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ’লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে’ *(ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)*।

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- (طه ١٧-٢١)-

‘হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?’ ‘মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে’। ‘আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও’। ‘অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে)

২২. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬৬, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘সতর’ অনুচ্ছেদ-৮।*

ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল’। ‘আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ *(ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)*।

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া **১ম** মু‘জেযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু‘জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু‘জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى- (طه ٢٢-٢٣)-

‘তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে’। ‘এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই’ *(ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)*।

নয়টি নিদর্শন:

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ- (إسراء ١٠١)- ‘আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম’ *(ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২)*। এখানে ‘নিদর্শন’ অর্থ একদল বিদ্বান ‘মু‘জেযা’ নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু‘জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় **১২টি** গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাঊনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু‘জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর

সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাঊনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরডুবি হ'তে নাজাত দান। তবে প্রথম দু'টিই ছিল সর্বপ্রধান মু'জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন *(নমল ২৭/১০, ১২)*।

অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ফেরাঊনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ– (الأعراف ١٣٠)– 'আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/১৩০)*।

হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে 'দুর্ভিক্ষ'সহ নয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাঊন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারী' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়েছিল এবং পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে মহামারী উঠে গিয়েছিল। এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে 'নয়' কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবুঅতের অকাট্ট দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে। অতএব আমরা সেখানে পৌঁছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

সিনাই হ'তে মিসর

প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীর জন্য আগুন আনতে গিয়ে মূসা এমন এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'লেন, যা রীতিমত ভীতিকর, শিহরণমূলক ও অভূতপূর্ব। তিনি স্ত্রীর জন্য আগুন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি-না বা পরিবারের সেবায় তিনি পরে কি কি ব্যবস্থা নিলেন- এসব বিষয়ে কুরআন

চুপ রয়েছে। কুরআনের গৃহীত বাকরীতি অনুযায়ী এ সবের বর্ণনা কোন যরূরী বিষয় নয়। কেননা এগুলি সাধারণ মানবিক তাকীদ, যা যেকোন স্বামীই তার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য করে থাকে। অতএব এখন আমরা সামনের দিকে আগাব।

আল্লাহ পাক মূসাকে নবুঅত ও প্রধান দু’টি মু‘জেযা দানের পর নির্দেশ দিলেন,

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِيْ- هَارُوْنَ أَخِي- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ- وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْراً- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْراً- (طه ٢٤-٣٥)-

হে মূসা! ‘তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে’। ভীত সন্ত্রস্ত মূসা বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’ ‘এবং আমার কাজ সহজ করে দিন’। ‘আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন’ ‘যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ ‘এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন’। ‘আমার ভাই হারূণকে দিন’। ‘তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্ত করুন’ ‘এবং তাকে (নবী করে) আমার কাজে অংশীদার করুন’। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী করে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি’ ‘এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি’। ‘আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন’ *(ত্বোয়াহা ২০/২৪-৩৫)*।

মূসার উপরোক্ত দীর্ঘ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- (طه ٣٦-٣٧)- ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ’ল’। শুধু এবার কেন, ‘আমি তোমার উপরে আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬-৩৭)*। বলেই আল্লাহ মূসাকে তার জন্মের পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ও ফেরাঊনের ঘরে লালন-পালনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্‌র খেলা বুঝা ভার। হত্যার টার্গেট হয়ে জন্মলাভ করে হত্যার ঘোষণা দানকারী সম্রাট ফেরাঊনের গৃহে পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে পরে যৌবনকালে পুনরায় হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে প্রাণভয়ে ভীত ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। অতঃপর সেখানে দীর্ঘ দশ বছর মেষপালকের চাকুরী করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে স্বদেশ ফেরার পথে রাহযানির ভয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় এসে কনকনে শীতের মধ্যে অন্ধকার রাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত স্বামী যখন অদূরে আলোর ঝলকানি দেখে আশায় বুক বেঁধে সেদিকে ছুটেছেন। তখন তিনি জানতেন না যে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন এক মহা সুসংবাদ যা দুনিয়ার কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, শোনেনি, কল্পনাও করেনি। বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ স্বয়ং স্বকণ্ঠে, স্বশব্দে ও স্ব-ভাষায় তাকে ডেকে কথা বলবেন, এও কি সম্ভব? শংকিত, শিহরিত, পুলকিত মূসা সবকিছু ভুলে পুরা দেহ-মন দিয়ে শুনছেন স্বীয় প্রভুর দৈববাণী। দেখলেন তাঁর নূরের তাজাল্লী। চাইলেন প্রাণভরে যা চাওয়ার ছিল। পেলেন সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে। এতে বুঝা যায়, পারিবারিক সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা সবই আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল যা কুরআনে উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি।

ওদিকে মূসার প্রার্থনা কবুলের সাথে সাথে আল্লাহ হারূণকে মিসরে অহীর মাধ্যমে নবুঅত প্রদান করলেন *(মারিয়াম ১৯/৫৩)* এবং তাকে মূসার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মূসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।[২৩]

মূসার পাঁচটি দো‘আ : নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মূসা (আঃ) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ’ল, যা নিম্নরূপ:

২৩. *কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর ‘হাদীছুল ফুতূন’; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭।*

প্রথম দো‘আ : رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِي ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো‘আ : وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ ‘আমার কর্ম সহজ করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহ্র একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো‘আ : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ‘আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ত্রুটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*, সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তাঁর জিভ পুড়ে গিয়েছিল। কেননা ফেরাঊনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাঊন হত্যা করতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি বেঁচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ করার জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী দু’টি পাত্র এনে মূসার সামনে রাখেন। মূসা তখন জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে একটা স্ফূলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাঊনও বুঝে নেন যে মূসা নিতান্তই

অবোধ। সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এগুলোর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ত্রুটি ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার কথা নেই। এর ফলে তিনি ফেরাউনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪]

চতুর্থ দো'আ : وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُوْنَ أَخِيْ 'আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন'। 'আমার ভাই হারূণকে'। পূর্বের তিনটি দো'আ ছিল তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কিত। অতঃপর চতুর্থ দো'আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। 'উযীর' অর্থ বোঝা বহনকারী। মূসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই হারূণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। অধিকন্তু তার উপরে ফেরাউনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী।

পঞ্চম দো'আ : وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ 'এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন'। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। 'যাতে আমরা বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)*। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্র দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক

---

২৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।

করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’। ‘আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)*।

উক্ত পাঁচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ ‘আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু’জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৫)*।

মূসা হ’লেন কালীমুল্লাহ :

তুবা প্রান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে মূসা কেবল নবী হ’লেন না। বরং তিনি হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’ বা আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী। যদিও শেষনবী (ছাঃ) মে‘রাজে আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে এভাবে বাক্যালাপের সৌভাগ্য কেবলমাত্র হযরত মূসা (আঃ)-এর হয়েছিল। আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে মূসা! আমি আমার বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৪)*। এভাবে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর সাথে আরেকবার কথা বলেন, সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার পরে শামে এসে একই স্থানে ‘তওরাত’ প্রদানের সময় *(আ‘রাফ ৭/১৩৮, ১৪৫)*। এভাবে মূসা হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও পুলকিত মূসা এখানে তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম

করলেন। অতঃপর মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। সিনাই থেকে অনতিদূরে মিসর সীমান্তে পৌঁছে গেলে যথারীতি বড় ভাই হারূণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

মূসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন :

ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে অলৌকিক লাঠি ও আলোকিত হস্ত তালুর দু'টি নিদর্শন নিয়ে মূসা (আঃ) মিসরে পৌঁছলেন *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)*। ফেরাঊন ও তার সভাসদ বর্গকে আল্লাহ (أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ) 'জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতৃবৃন্দ' *(ক্বাছাছ ২৮/৪১)* হিসাবে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 'ফাসেক' বা পাপাচারী *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)* বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক মূসাকে বললেন 'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না'। 'তোমরা উভয়ে ফেরাঊনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে'। 'তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাষায় কথা বলবে। তাতে হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে'। 'তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপরে যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে'। 'আল্লাহ বললেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের (সব কথা) শুনবো ও (সব অবস্থা) দেখব' *(ত্বোয়াহা ২০/৪২-৪৬)*।

ফেরাঊনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

আল্লাহ্র নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ- (الأعراف ١٠٤-١٠٥)-

'হে ফেরাঊন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত।

আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও’ *(আ‘রাফ ৭/১০৪-১০৫)*। মূসার এদাবী থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় বনু ইস্রাঈলের উপরে ফেরাঊনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মূসা তখনই বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যাননি। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى- إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- (طه ٤٧-٤٨)-

....‘তুমি বনু ইস্রাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না’। ‘আমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপরে আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪৭-৪৮)*। একথা শুনে ফেরাঊন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘মূসা! তোমার পালনকর্তা কে’? ‘মূসা বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন’। ‘ফেরাঊন বলল, তাহ’লে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?’ ‘মূসা বললেন, তাদের খবর আমার প্রভুর কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না’। একথা বলার পর মূসা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ বর্ণনা শুরু করলেন, যাতে ফেরাঊন তার যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, ‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে চলার পথ সমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন’। ‘তোমরা তা আহার কর ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাক। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫৪)*।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ :

১. বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান।

২. আল্লাহ প্রেরিত সত্যই প্রকৃত সত্য। তার ব্যতিক্রম কিছু না বলা বা না করার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত থাকার ঘোষণা প্রদান।

৩. আল্লাহ্র গযবের ভয় প্রদর্শন।

৪. আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ।

৫. পিছনের লোকদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করে বর্তমান অবস্থার সংশোধনের প্রতি আহ্বান।

৬. মযলূম বনু ইস্রাঈলের মুক্তির জন্য যালেম ফেরাউনের নিকটে আবেদন।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ফেরাউনের অহংকারী হৃদয়ে মূসার দাওয়াত ও উপদেশবাণী কোনরূপ রেখাপাত করল না। বরং সে পরিষ্কার বলে দিল,

مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ- وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ- (القصص ٣٦-٣٧)-

‘তোমার এসব অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এসব কথা শুনিনি’। ‘মূসা বললেন, ‘আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬-৩৭)*।

ফেরাউন তার সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। এরপর সে মূসার প্রতিশ্রুত ‘পরকালের গৃহ’ (عَاقِبَةُ الدَّارِ) দেখার জন্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উযীরকে বলে উঠল,

فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَل لِّيْ صَرْحاً لَّعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ- (القصص ٣٨-٣٩)-

‘হে হামান! তুমি ইট পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার ধারণা সে একজন মিথ্যাবাদী’। একথা বলে ‘ফেরাঊন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে অহংকারে ফেটে পড়ল। তারা ধারণা করল যে, তারা কখনোই আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮-৩৯; গাফির/মুমিন ২৩/৩৬-৩৭)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ও হারূণ যখন ফেরাঊনের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল’। ‘তুমি বনু ইস্রাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও’ *(শো‘আরা ২৬/১৬-১৭)*। ফেরাঊন তখন বাঁকা পথ ধরে প্রশ্ন করে বসলো, ‘আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বহু বছর কাটাওনি? *(১৮)*। ‘আর তুমি করেছিলে (হত্যাকাণ্ডের) সেই অপরাধ, যা তুমি করেছিলে। (এরপরেও তুমি আমাকে পালনকর্তা না মেনে অন্যকে পালনকর্তা বলছ?) আসলে তুমিই হ’লে কাফির বা কৃতঘ্নদের অন্তর্ভুক্ত (وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ =১৯)’। জবাবে মূসা বললেন, ‘আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম’ *(২০)*। ‘অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করেছিলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন ও আমাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন’ *(২১)*। ‘অতঃপর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ তা এই যে, তুমি বনু ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ’ *(২২)*। ফেরাঊন একথার জবাব না দিয়ে আক্বীদাগত প্রশ্ন তুলে বলল, তোমাদের কথিত ‘বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কে?’*(২৩)* মূসা বললেন, ‘তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’*(২৪)*। এ জবাব শুনে ‘ফেরাঊন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না’?*(২৫)*। ....‘আসলে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এ রাসূলটি একটা আস্ত পাগল (قَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

إِنَّ رَسُولَكُمُ =২৭)। ...‘অতঃপর ফেরাঊন মূসাকে বলল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ- (الشعراء ٢٩)- ‘যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব’*(২৯)*। মূসা বললেন, ‘আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলেও কি (তুমি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে)? *(শো‘আরা ২৬/১৮-৩০)*।

তখন ফেরাঊন তাচ্ছিল্যভরে বলল, হে মূসা! ‘যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহ’লে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক’*(৩১)*। ‘মূসা তখন নিজের হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা একটা জ্বলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল’*(৩২)*। ‘তারপর (বগল থেকে) নিজের হাত বের করলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে আলোকোজ্জ্বল দেখাতে লাগল’ *(শো‘আরা ২৬/৩১-৩৩; আ‘রাফ ৭/১০৬-১০৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতূনে’ বলা হয়েছে যে, বিশাল ঐ অজগর সাপটি যখন বিরাট হা করে ফেরাঊনের দিকে এগিয়ে গেল, তখন ফেরাঊন ভয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে মূসার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল এবং তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

উল্লেখ্য যে, মূসার প্রদর্শিত লাঠির মো‘জেযাটি ছিল অত্যাচারী সম্রাট ও তার যালেম সম্প্রদায়ের ভয় দেখানোর জন্য। এর দ্বারা তাদের যাবতীয় দুনিয়াবী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রদীপ্ত হস্ততালুর দ্বিতীয় মো‘জেযাটি দেখানো হয়, এটা বুঝানোর জন্যে যে, তাঁর আনীত এলাহী বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা। যাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক জীবনে শান্তি ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা।

মু‘জেযা ও জাদু :

মু‘জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। (১) ‘মু‘জেযা’ কেবল নবীগণের জন্য খাছ এবং ‘কারামত’ আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু‘জেযা নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল

দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। কিন্তু মু‘জেযা আল্লাহ্র হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। (৪) মু‘জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে।

জাদুতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাঊনের সম্প্রদায় ঐ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক। সেকারণ তাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযাকে তারা বড় ধরনের একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র। তবে তারা তাঁকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং ‘বিজ্ঞ জাদুকর’ (سَاحِرٌ عَلِيْمٌ) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল *(আ‘রাফ ৭/১০৯)*। কারণ তাদের হিসাব অনুযায়ী মূসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইরাকের বাবেল নগরী তৎকালীন পৃথিবীতে জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে। তখন আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, ইনসান, বায়ু ও পশুপক্ষীর উপর ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। এগুলিকে লোকেরা জাদু ভাবে এবং তার নবুঅতকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে জাদু ও মু‘জেযার পার্থক্য বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেন। যাতে লোকেরা জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়।

মূসার দাওয়াতের পর ফেরাঊনী অবস্থান :

মূসার মো‘জেযা দেখে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই মূসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, ‘লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর’। ‘সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় (অর্থাৎ সে নিজে দেশের শাসক হ’তে চায়), এক্ষণে এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? ‘লোকেরা ফেরাঊনকে বলল, ‘আপনি তাকে ও তার ভাইকে

অবকাশ দিন এবং শহর ও নগরী সমূহের সর্বত্র খবর পাঠিয়ে দিন লোকদের জমা করার জন্য'। 'যাতে তারা সকল বিজ্ঞ জাদুকরদের সমবেত করে' *(আ'রাফ ৭/১০৯-১১২)*।

ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তাহ'লে আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)*।

ফেরাঊনের জবাবের সার-সংক্ষেপ :

১. অদৃশ্য পালনকর্তা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে দৃশ্যমান পালনকর্তা হিসাবে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা বলে দাবী করা *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*।

২. শৈশবে লালন-পালনের দোহাই পেড়ে তাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার না করায় উল্টা মূসাকেই 'কাফির' বা কৃতঘ্ন বলে আখ্যায়িত করা *(শো'আরা ২৬/১৯)*।

৩. পূর্ব পুরুষের কারু কাছে এমন কথা না শোনার বাহানা পেশ করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।

৪. আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাওয়ার কথা অস্বীকার করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*।

৫. পরকালকে অস্বীকার করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৭)*।

৬. মূসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ও হত্যার হুমকি প্রদান করা *(শো'আরা ২৬/২৯; মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।

৭. নবুঅতের মু'জেযাকে অস্বীকার করা এবং একে জাদু বলে অভিহিত করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।

৮. মূসার নিঃস্বার্থ দাওয়াতকে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত বলে অপবাদ দেওয়া *(আ'রাফ ৭/১১০; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।

৯. নিজের কথিত ধর্ম রক্ষা ও নিজেদের রচিত বিধি-বিধান সমূহ রক্ষার দোহাই দিয়ে মূসার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।

১০. মূসাকে দেশে ফেৎনা সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করা *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।

বস্তুতঃ এই ধরনের অপবাদসমূহ যুগে যুগে প্রায় সকল নবীকে ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারক গণকে দেওয়া হয়েছে এবং আজও দেওয়া হচ্ছে।

নবুঅত পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা (আঃ) পয়গম্বর সূলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى- (طه ٦١)- ‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যারোপ করে, তারাই বিফল মনোরথ হয়’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হ’ল না। ফেরাঊন উঠে গিয়ে ‘তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হ’ল’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬০)*। ‘অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল’। ‘তারা বলল, এই দু’জন লোক নিশ্চিতভাবেই জাদুকর। তারা তাদের জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারা রহিত করতে চায়’। ‘অতএব (হে জাদুকরগণ!) তোমরা তোমাদের যাবতীয় কলা-কৌশল সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে এসো। আজ যে জয়ী হবে, সেই-ই সফলকাম হবে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩-৬৪)*।

জাদুকররা ফেরাঊনের নিকট সমবেত হয়ে বলল, জাদুকর ব্যক্তিটি কি দিয়ে কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীতে আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ করতে পারে (*‘হাদীছুল কুতূন’ নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর*)। অতএব ‘আমাদের জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই’? ‘সে বলল, হ্যাঁ। তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ *(আ‘রাফ ৭/১১৩-১১৪)*।

জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৫)*। মূসা বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা 'তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*, তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল' *(আ'রাফ ৭/১১৬)*। 'তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ'ল যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে'। 'তাতে মূসার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হ'ল' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে মূসাকে অভয় দিয়ে বললেন, قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى- وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى- (طه ٦٨-٦٩)- 'তুমিই বিজয়ী হবে' 'তোমার ডান হাতে যা আছে, তা (অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস করে ফেলবে। তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র। বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই থাকুক সে সফল হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)*।

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ- (الشعراء ٤٤)- 'ফেরাঊনের মর্যাদার শপথ! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*। তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল' *(শো'আরা ২৬/৪৫)*।

এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে বড় জাদুকর হ'লে এতদিন তার নাম শোনা যেত। তার উস্তাদের খবর জানা যেত। তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। তার পরিবারেও কোন জাদুকর নেই। তার বড় ভাই হারূণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে

পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহ্র গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। আল্লাহ বলেন, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ- (الأعراف ١١٨-١١٩)- ‘অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হ’ল এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম’। ‘এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত হ’ল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল’ *(আ‘রাফ ৭/১১৮-১১৯)*। অতঃপর فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ- (الشعراء ٤٦-٤٨)- ‘তারা সিজদায় পড়ে গেল’। এবং ‘বলে উঠল, আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা ও হারূণের রব’ *(শো‘আরা ২৬/৪৬-৪৮; ত্বোয়াহা ২০/৭০; আ‘রাফ ৭/১২০-১২১)*।

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল ফেরাঊন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ- (طه ٧١)- ‘আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭১; আ‘রাফ ৭/১২৩; শো‘আরা ২৬/৪৯)*। অতঃপর সম্রাট সুলভ হুমকি দিয়ে বলল, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ- (الشعراء ٤٩)- ‘শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণাম ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব’ *(শো‘আরা ২৬/৪৯)*। জবাবে জাদুকররা বলল, لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ- إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ- (الشعراء ٥٠-٥١)- ‘কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব’*(৫০)*। ‘আশা করি

আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করবেন’ *(শো‘আরা ২৬/৪৯-৫১; ত্বোয়াহা ২০/৭১-৭৩; আ‘রাফ ৭/১২৪-১২৬)*।

উল্লেখ্য যে, জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার এই দিনটি (يوم الزينة) ছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন (يوم عاشوراء) (*ইবনু কাছীর, ‘হাদীছুল ফুতূন’*)। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন। কেউ বলেছেন, বাজারের দিন। কেউ বলেছেন, নববর্ষের দিন (*তাফসীরে কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৫৯*)।

ফেরাঊনের ছয়টি কুটচাল :

জাদুকরদের পরাজয়ের পর ফেরাঊন তার রাজনৈতিক কুটচালের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। তার চালগুলি ছিল, (১) সে বলল: এই জাদুকররা সবাই মূসার শিষ্য। তারা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এটা একটা পাতানো খেলা মাত্র। আসলে ‘মূসাই হ’ল বড় জাদুকর’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭১)*। (২) সে বলল, মূসা তার জাদুর মাধ্যমে ‘নগরীর অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চায়’ *(আ‘রাফ ৭/১১০)* এবং মূসা ও তার সম্প্রদায় এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। (৩) সে বলল মূসা যেসব কথা বলছে ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেসব কথা কখনো শুনিনি’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*। (৪) সে বলল, হে জনগণ! এ লোকটি তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে ও দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৬)*। (৫) সে বলল, মূসা তোমাদের উৎকৃষ্ট (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক) জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। (৬) সে মিসরীয় জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)* এবং একটির দ্বারা অপরটিকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছিল। আজকের বহুদলীয় গণতন্ত্র বা দলতন্ত্র ফেলে আসা ফেরাঊনী তন্ত্রের আধুনিক রূপ বলেই মনে হয়। নিজেই সবকিছু করলেও লোকদের খুশী করার জন্য ফেরাঊন বলল, فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ‘অতএব হে জনগণ! তোমরা এখন কি বলতে চাও’? *(শো‘আরা ২৬/৩৫; আ‘রাফ ৭/১১০)*। এযুগের নেতারা যেমন নিজেদের সকল অপকর্ম জনগণের দোহাই দিয়ে করে থাকেন।

ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ :

অধিকাংশের রায় যে সবসময় সঠিক হয় না বরং তা আল্লাহ্র পথ হ’তে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার বড় প্রমাণ হ’ল ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও মূসার আপাত পরাজয়। ফেরাঊনের ভাষণে উত্তেজিত জনগণের পক্ষে নেতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হে সম্রাট! أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ- (الأعراف ١٢٧)- ‘আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনিই ছেড়ে দেবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য’ *(আ‘রাফ ৭/১২৭)*।

জাদুকরদের সত্য গ্রহণ :

ধূর্ত ও কুটবুদ্ধি ফেরাঊন বুঝলো যে, তার ঔষধ কাজে লেগেছে। এখুনি মোক্ষম সময়। সে সাথে সাথে জাদুকরদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে অতঃপর খেজুর গাছের সাথে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিল। সে ভেবেছিল, এতে জাদুকররা ভীত হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে। কিন্তু ফল উল্টা হ’ল। তারা একবাক্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিল,

لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى- (طه ٧٢-٧٣)-

‘আমরা তোমাকে ঐসব সুস্পষ্ট নিদর্শন (ও মু‘জেযার) উপরে প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো (মূসার মাধ্যমে) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং প্রধান্য দিতে পারি না তোমাকে সেই সত্তার উপরে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে’*(৭২)*। ‘আমরা আমাদের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, (তার পাপসমূহ) তা মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৩)*।

তারা আরও বলল,

قَالُوْا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ– وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ–َ– (الأعراف ١٢٥-١٢٦)–

'আমরা (তো মৃত্যুর পরে) আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকটে ফিরে যাব'। 'বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো কেবল একারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সমূহের প্রতি, যখন তা আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। অতএব رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য ধৈর্যের দুয়ার খুলে দাও এবং আমাদেরকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ৭/১২৫-১২৬)*।

এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ইতিপূর্বে ফেরাঊনের দরবারে মূসার লাঠির মু'জেযা প্রদর্শনের ঘটনা থেকেই জাদুকরদের মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, এটা কোন জাদু নয়, এটা মু'জেযা। কিন্তু ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে তারা মুখ খুলেনি। অবশেষে তাদেরকে সমবেত করার পর তাদেরকে সম্রাটের নৈকট্যশীল করার ও বিরাট পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রলোভনের চাপ ভিন্ন কিছুই ছিল না।

জাদুকরদের মুসলমান হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল মুকাবিলার পূর্বে ফেরাঊন ও তার জাদুকরদের উদ্দেশ্যে মূসার প্রদত্ত উপদেশমূলক ভাষণ। যেখানে তিনি বলেছিলেন,

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَ– (طه ٦١)–

'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুতঃ তারাই বিফল মনোরথ হয়, যারা মিথ্যারোপ করে' *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*।

মূসার মুখে একথা শুনে ফেরাঊন ও তার সভাসদরা অহংকারে স্ফীত হ'লেও জাদুকর ও সাধারণ জনগণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে জাদুকরদের মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যায় এবং তারা আপোষে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদিও গোপন আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ রাজকীয় সম্মান ও বিরাট অংকের পুরস্কারের লোভে পরিশেষে তারা একমত হয়।

জাদুরকদের পরিণতি :

জাদুকরদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হ’লেও ত্বোয়াহা ৭২ হ’তে ৭৬ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াত সমূহের বাকভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছিল। কেননা নিষ্ঠুরতার প্রতীক ফেরাঊনের দর্পিত ঘোষণার জবাবে দৃঢ়চিত্ত ঈমানদার জাদুকরদের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হয়েছিল, তা সকল ভয় ও দ্বিধা-সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবায়েদ ইবনু উমায়ের ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, أَصْبَحُوْا سَحَرَةً وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ ‘যারা সকালে জাদুকর ছিল, তারা সন্ধ্যায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল’।[২৫] মূলতঃ এটাই হ’ল প্রকৃত মা‘রেফাত, যা যেকোন ভয়-ভীতির মুকাবিলায় মুমিনকে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল রাখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষায়। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী।*

জনগণের প্রতিক্রিয়া :

আল্লাহ বলেন,

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ-(يونس ٨٣)-

‘ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর ফেরাঊন তার দেশে ছিল পরাক্রান্ত এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউনুস ১০/৮৩)*। এতে বুঝা যায় যে, ক্বিবতীদের মধ্যে গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা বেশী থাকলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল।

উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে ‘তার কওমের কিছু লোক ব্যতীত’ (إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ) বলতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) ‘ফেরাঊনের কওমের কিছু লোক’ বলেছেন। কিন্তু ইবনু জারীর ও অনেক বিদ্বান মূসার নিজ কওম ‘বনু ইস্রাঈলের কিছু লোক’ বলেছেন। এর জবাবে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন,

---

২৫. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ৭০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৪২।*

এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, বনু ইস্রাঈলের সকলেই মূসাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করত একমাত্র ক্বারূণ ব্যতীত। কেননা সে ছিল বিদ্রোহী এবং ফেরাঊনের সাথী। আর মূসার কারণেই বনু ইস্রাঈলগণ মূসার জন্মের আগে ও পরে সমানভাবে নির্যাতিত ছিল (*আ'রাফ ৭/১২৯*)। অতএব অত্র আয়াতে যে মুষ্টিমেয় লোকের ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন ক্বিবতী সম্প্রদায়ের। আর তারা ছিলেন, ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া, ফেরাঊনের চাচাতো ভাই জনৈক মুমিন ব্যক্তি যিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং ফেরাঊনের খাজাঞ্চি ও তার স্ত্রী। যেকথা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন।[২৬]

ফেরাঊনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া :

জাদুকরদের সঙ্গে মুকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ফেরাঊনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা (أمه البديلة) 'আসিয়া' উক্ত মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হ'ল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে ওঠেন, آمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ 'আমি মূসা ও হারূণের পালনকর্তার উপরে ঈমান আনলাম'। নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেরাঊন তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।[২৭] মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া কাতর কণ্ঠে স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ-

'আল্লাহ ঈমানদারগণের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ফেরাঊনের স্ত্রীর, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর! আমাকে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের হাত থেকে উদ্ধার কর এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' (*তাহরীম ৬৬/১১*)।

---

২৬. *তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইউনুস ১০/৮৩।*
২৭. *কুরতুবী, ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১।*

কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত :

পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ পাক চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তা থেকে সকলকে উপদেশ হাছিল করতে বলেছেন। প্রথম দু’জন দু’নবীর পত্নী। একজন নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী, অন্যজন লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রী। এ দু’জন নারী তাওহীদ বিষয়ে আপন আপন স্বামীর তথা স্ব স্ব নবীর দাওয়াতে বিশ্বাস আনয়ন করেননি। বরং বাপ-দাদার আমলের শিরকী আক্বীদা ও রীতি-নীতির উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছেন। পয়গম্বরগণের সাথে বৈবাহিক সাহচর্য তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

বাকী দু’জন নারীর একজন বিশ্বসেরা নাস্তিক ও দাম্ভিক সম্রাট ফেরাঊনের পুণ্যশীলা স্ত্রী ‘আসিয়া’ বিনতে মুযাহিম। তিনি মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করেন। ফেরাঊনের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড তিনি হাসিমুখে বরণ করে নেন। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ প্রদর্শন করেছেন।[২৮] চতুর্থ জন হ’লেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মারিয়াম বিনতে ইমরান। স্বীয় ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তিনি আল্লাহ্র নিকটে মহান মর্যাদার অধিকারিণী হন। এ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক প্রত্যেকে স্ব স্ব ঈমান ও আমলের কারণে জান্নাতের অধিকারী হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

মূসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনয়নকারিনী আসিয়াকে শেষনবী (ছাঃ) জগৎ শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার মধ্যে শামিল করেছেন। উক্ত চারজন হ’লেন ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম, মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ।[২৯]

নবুঅত-পরবর্তী ২য় পরীক্ষা : বনু ইস্রাঈলদের উপরে আপতিত ফেরাঊনী যুলুম সমূহ :

জাদুর পরীক্ষায় পরাজিত ফেরাঊনের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল এবার নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপর। জাদুকরদের ঈমান আনয়ন, অতঃপর তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান, বিবি আসিয়ার ঈমান আনয়ন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি

---

২৮. আবু ইয়া‘লা, ত্বাবারাণী, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮; আলবানী বলেন, হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মওকূফ ছহীহ, যা মরফূ হুকমীর পর্যায়ভুক্ত।

২৯. তিরমিযী আনাস (রাঃ) হ’তে, মিশকাত হা/৬১৮১ ‘মানাক্বিব’ অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ; আহমাদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ।

নিষ্ঠুর দমন নীতির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত নোংরা কুটচাল ও মিথ্যা অপবাদ সমূহের মাধ্যমে মূসার ঈমানী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল ফেরাঊন। কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে মূসার দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে ফেরাঊন ও তার অহংকারী পারিষদবর্গ নতুনভাবে দমন নীতির কৌশলপত্র প্রণয়ন করল। তারা নিজেরা বিধর্মী হ'লেও সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করল। অন্যদিকে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর'-এই কুটনীতির অনুসরণে ফেরাঊনের ক্বিবতী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে কেবল বনু ইস্রাঈলদের উপরে চূড়ান্ত যুলুম ও নির্যাতনের পরিকল্পনা করল।

১ম যুলুমঃ বনু ইস্রাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি :

ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিপূর্বে ফেরাঊনকে বলেছিল, أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য? *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। নেতারা মূসা ও হারূণের ঈমানী দাওয়াতকে 'ফাসাদ' বলে অভিহিত করেছিল। এক্ষণে দেশময় মূসার দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য এবং ফেরাঊনের নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে মূসার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু না বলে নিরীহ বনু ইস্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেরাঊন বলল, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِـــي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ- (الأعراف ١٢٧)- 'আমি এখুনি টুকরা টুকরা করে হত্যা করব ওদের পুত্র সন্তানদেরকে এবং বাঁচিয়ে রাখব ওদের কন্যা সন্তানদেরকে। আর আমরা তো ওদের উপরে (সবদিক দিয়েই) প্রবল' *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। এভাবে মূসার জন্মকালে বনু ইস্রাঈলের সকল নবজাতক পুত্র হত্যা করার সেই ফেলে আসা লোমহর্ষক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা প্রদান করা হ'ল।

দল ঠিক রাখার জন্য এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের রোষাগ্নি প্রশমনের জন্য ফেরাঊন অনুরূপ ঘোষণা দিলেও মূসা ও হারূণ সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। যদিও ইতিপূর্বে সে মূসাকে কারারুদ্ধ করার এমনকি হত্যা

করার হুমকি দিয়েছিল *(শো‘আরা ২৬/২৯; মুমিন ৪০/২৬)*। কিন্তু জাদুকরদের পরাজয়ের পর এবং নিজে মূসার সর্পরূপী লাঠির মু‘জেযা দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ার পর থেকে মূসার দিকে তাকানোর মত সাহসও তার ছিল না।

যাই হোক ফেরাঊনের উক্ত নিষ্ঠুর ঘোষণা জারি হওয়ার পর বনু ইস্রাঈলগণ মূসার নিকটে এসে অনুযোগের সুরে বলল, أُوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ‘তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার এখন তোমার আগমনের পরেও তাই করা হচ্ছে’ *(আ‘রাফ ৭/১২৯)*। অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় আমাদের দিন কাটত যে, সত্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য একজন নবীর আগমন ঘটবে। অথচ এখন তোমার আগমনের পরেও সেই একই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাহ’লে এখন আমাদের উপায় কি?

আসন্ন বিপদের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমের লোকদের সান্ত্বনা দিয়ে মূসা (আঃ) বললেন, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ‘তোমাদের পালনকর্তা শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর’ *(আ‘রাফ ৭/১২৯)*। তিনি বললেন, اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ‘তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকটে এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। বস্তুতঃ চূড়ান্ত পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত’ *(আ‘রাফ ৭/১২৮)*।

মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বলেন,

يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنتُم مُّسْلِمِينَ- فَقَالُوْا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- (يونس ٨٤-٨٦)-

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপরে ভরসা কর যদি তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক’। জবাবে তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপরে এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না’। ‘আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও’ *(ইউনুস ১০/৮৪-৮৬)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সূলভ দরদ ও দূরদর্শিতার আলোকে মূসা (আঃ) স্বীয় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমকে মূলতঃ দু’টি বিষয়ে উপদেশ দেন। **এক-** শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং **দুই-** আল্লাহ্র সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। তিনি যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং নিঃসন্দেহে শেষফল মুত্তাক্বীদের জন্যই নির্ধারিত।

২য় যুলুমঃ ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করা :

পুত্র শিশু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক যুলুমের সাথে সাথে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। বনু ইস্রাঈলদের ধর্মীয় বিধান ছিল এই যে, তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা করতে হ’ত। এক্ষণে সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় মূসা ও হারূণের প্রতি আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত নির্দেশ পাঠান-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ-(يونس ٨٧)-

‘আর আমরা নির্দেশ পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলিকে কিবলামুখী করে তৈরী কর ও সেখানে ছালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও’।*(ইউনুস ১০/৮৭)*।

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত বিধান নাযিলের ফলে বনু ইস্রাঈলগণ স্ব স্ব ঘরেই ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভ করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে যে ক্বিবলার দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন, সেটা ছিল কা‘বা শরীফ’ *(কুরতুবী, রূহুল মা‘আনী)*। বরং কোন কোন বিদ্বান বলেছেন

যে, বিগত সকল নবীর ক্বিবলা ছিল কা‘বা গৃহ। লক্ষণীয় যে, মূসার অতুলনীয় নবুঅতী মো‘জেযা থাকা সত্ত্বেও এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ্র স্পষ্ট ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও ফেরাঊনী যুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহ মূসাকে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেননি। বরং যুলুম বরদাশত করার ও ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন। ইবাদতগৃহ সমূহ ভেঙ্গে দিয়েছে বলে তা রক্ষার জন্য জীবন দিতে বলা হয়নি। *(টীকা: অতএব উপাসনালয় ধ্বংস করা ফেরাঊনী কাজ)*। বরং স্ব স্ব গৃহকে কেবলামুখী বানিয়ে সেখানেই ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা একটা মূলনীতি বেরিয়ে আসে যে, পরাক্রান্ত যালেমের বিরুদ্ধে দুর্বল মযলূমের কর্তব্য হ’ল ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র উপরেই সবকিছু সোপর্দ করা।

ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসার বদ দো‘আ :

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ- قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ- (يونس ٨٨-٨٩)-

‘মূসা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাঊনকে ও তার সর্দারদেরকে পার্থিব আড়ম্বর সমূহ ও সম্পদরাজি দান করেছ, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে তোমার রাস্তা থেকে বিপথগামী করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি তাদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও ও তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও, যাতে তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে’*(৮৮)*। জবাবে আল্লাহ বললেন, তোমাদের দো‘আ কবুল হয়েছে। অতএব তোমরা দু’জন অটল থাক এবং অবশ্যই তোমরা তাদের পথে চলো না, যারা জানে না’ *(ইউনুস ১০/৮৮-৮৯)*।

মূসা ও হারূণের উপরোক্ত দো‘আ আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে করলেন না। বরং সময় নিলেন অন্যূন বিশ বছর। এরূপ প্রলম্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মাযলূমের ধৈর্য পরীক্ষার সাথে সাথে যালেমেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং তাদের তওবা করার ও হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দেন। যাতে পরে তাদের জন্য ওযর পেশ করার কোন সুযোগ না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ

بَعْضَكُم بِبَعْضٍ 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এত যুলুম সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের হিজরত করার নির্দেশ না দিয়ে সেখানেই পুনরায় ঘর বানিয়ে বসবাসের নির্দেশ দিলেন কেন? এর জবাব দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক- ফেরাঊন তাদেরকে হিজরতে বাধা দিত। কারণ বনু ইস্রাঈলগণকে তারা তাদের জাতীয় উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে এবং কর্মচারী ও সেবাদাস হিসাবে ব্যবহার করত। তাছাড়া পালিয়ে আসারও কোন পথ ছিল না। কেননা নীলনদ ছিল বড় বাধা। নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ফেরাঊনী সেনারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত।

দুই- ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূসা ও হারূণের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা। মূলতঃ এটিই ছিল আল্লাহ্র মূল উদ্দেশ্য। কেননা যতদিন তারা মিসরে ছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তার ফলে বহু আল্লাহ্র বান্দা পথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ফেরাঊন দেখেছিল তার দুনিয়াবী লাভ ও শান-শওকত। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ও মানুষের হেদায়াত। সেটিই হয়েছে। ফেরাঊনেরা এখন মিসরের পিরামিডের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ মিসর সহ বলা চলে পুরা আফ্রিকায় এখন ইসলামের জয়-জয়কার অব্যাহত রয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

ফেরাঊনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) দুষ্টু শাসকগণ তার পদে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'ফেরাঊন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল' *(ইউনুস ১০/৮৩)*। সে দাবী করেছিল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা' *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*। অতএব 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। যেহেতু সে তৎকালীন পৃথিবীর এক সভ্যতাগর্বী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল, সেহেতু তার এ দাবী মিথ্যা ছিল না। এর দ্বারা সে নিজেকে 'সৃষ্টিকর্তা' দাবী করত না বটে, কিন্তু নিজস্ব বিধানে প্রজাপালনের কারণে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা ভেবেছিল। তার অহংকার তার চক্ষুকে

নবী মূসার অহীর বিধান মান্য করা থেকে অন্ধ করে দিয়েছিল। যুগে যুগে আবির্ভূত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অবস্থা এ থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। আজও নয়। প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ শাসক মনে করে এবং ঐ পদে কাউকে শরীক ভাবতে পারে না।

(২) তারা তাদের বিরোধীদেরকে ধর্ম বিরোধী ও সমাজ বিরোধী বলে। ফেরাঊন বলেছিল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও। সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে। আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের দ্বীন এবং প্রচলিত উৎকৃষ্ট রীতিনীতি পরিবর্তন করতে চায় এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় *(মুমিন ৪০/২৬, ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। সকল যুগের ফেরাঊনরা তাদের বিরুদ্ধ বাদীদের উক্ত কথাই বলে থাকে।

(৩) তারা সর্বদা নিজেদেরকে জনগণের মঙ্গলকামী বলে। নিজ সম্প্রদায়ের জনৈক গোপন ঈমানদার ব্যক্তি যখন মূসাকে হত্যা না করার ব্যাপারে ফেরাঊনকে উপদেশ দিল, তখন তার জবাবে ফেরাঊন বলল, ‘আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি’ *(মুমিন ৪০/২৯)*। সকল যুগের ফেরাঊনরাও একই কথা বলে আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মনগড়া বিধান প্রতিষ্ঠায় জনগণের নামে জনগণের উপরে যুলুমের স্টীম রোলার চালিয়ে থাকে।

(৪) তাদের দেওয়া জেল-যুলুম ও হত্যার হুমকির বিপরীতে ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও পরিণামে মযলূম বিজয়ী হয় ও যালেম পর্যুদস্ত হয়। যেমন কারাদণ্ড ও হত্যার হুমকি ও ফেরাঊনী যুলুমের উত্তরে মূসার বক্তব্য ছিল: وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ‘আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল অহংকারী থেকে যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না’ *(মুমিন ৪০/২৭)*। ফলে ‘আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং পরে ফেরাঊন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল’ *(মুমিন ৪০/৪৫)*। এযুগেও মযলূমের কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে থাকেন ও যালেমকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা সমূহ :

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষার ঘটনার পর মূসা (আঃ) অন্যূন বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে প্রধান ৯টি মু'জেযা দান করেন। তবে প্লেগ মহামারী সহ *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। মোট নিদর্শনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। যার মধ্যে প্রথম দু'টি শ্রেষ্ঠ মু'জেযা ছিল অলৌকিক লাঠি ও আলোকময় হস্ততালু। যার পরীক্ষা শুরুতেই ফেরাঊনের দরবারে এবং পরে জাদুকরদের সম্মুখে হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাকীগুলি এসেছিল ফেরাঊনী কওমের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সাবধান করার জন্য। মূলতঃ দুনিয়াতে প্রেরিত সকল এলাহী গযবের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ- (السجدة ٢١)- 'কাফির ও ফাসিকদেরকে (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

মযলূম বনু ইস্রাঈলদের কাতর প্রার্থনা এবং মূসা ও হারূণের দো'আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। সেমতে সর্বপ্রথম অহংকারী ফেরাঊনী কওমের দুনিয়াবী জৌলুস ও সম্পদরাজি ধ্বংসের গযব নেমে আসে। তারপর আসে অন্যান্য গযব বা নিদর্শন সমূহ। আমরা সেগুলি একে একে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। যাতে এযুগের মানুষ তা থেকে উপদেশ হাছিল করে।

মোট নিদর্শন সমূহ, যা মিসরে প্রদর্শিত হয়-

(১) লাঠি (২) প্রদীপ্ত হস্ততালু (৩) দুর্ভিক্ষ (৪) তূফান (৫) পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত (৯) প্লেগ (১০) সাগরডুবি। প্রথম দু'টি এবং মূসার ব্যক্তিগত তোতলামি দূর হওয়াটা বাদ দিয়ে বাকী ৮টি নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১ম নিদর্শন : দুর্ভিক্ষ

মূসা (আঃ)-এর দো‘আ কবুল হওয়ার পর ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রথম নিদর্শন হিসাবে দুর্ভিক্ষের গযব নেমে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ- (أعراف ١٣٠)- ‘তারপর আমরা পাকড়াও করলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করে’ *(আ‘রাফ ৭/১৩০)*।

নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপরে দুর্ধর্ষ ফেরাঊনী যুলুম প্রতিরোধে এটা ছিল মযলূমদের সমর্থনে আল্লাহ প্রেরিত প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত। এর ফলে তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। ফলে কোন উপায়ান্তর না দেখে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। দয়ার্দ্রচিত্ত মূসা (আঃ) অবশেষে দো‘আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেল এবং তাদের বাগ-বাগিচা ও মাঠ-ময়দান পুনরায় ফল-ফসলে ভরে উঠলো। কিন্তু ফেরাঊনী সম্প্রদায় এতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে খোদ মূসাকেই দায়ী করে তাঁকে ‘অলক্ষুণে-অপয়া’ বলে গালি দেয় এবং উদ্ধতভাবে বলে ওঠে যে, وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ- (الأعراف ١٣٢)- ‘আমাদের উপরে জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার উপরে কোন মতেই ঈমান আনব না’ *(আ‘রাফ ৭/১৩২)*। আল্লাহ বলেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْماً مُّجْرِمِيْنَ- (الأعراف ١٣٣)-

‘অতঃপর আমরা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলাম তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পরে এক। তারপরেও তারা অহংকার করতে থাকল। বস্ততঃ তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৩)*।

অত্র আয়াতে দুর্ভিক্ষের পরে পরপর পাঁচটি গযব নাযিলের কথা বলা হয়েছে। তারপর আসে প্লেগ মহামারী ও অন্যান্য ছোট-বড় আযাব' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। এরপরে সর্বশেষ গযব হ'ল সাগরডুবি' *(ইউনুস ১০/৯০)*। যার মাধ্যমে এই গর্বিত অহংকারীদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুযায়ী آيَاتٌ مُفَصَّلاَتٌ বা 'একের পর এক আগত নিদর্শনসমূহ' অর্থ হ'ল, এগুলোর প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু দিন বিরতির পর অন্যান্য আযাবগুলি আসে'। ফেরাঊন সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত বর্ণনায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ- (الأعراف ١٣٤-١٣٥)

'আর যখন তাদের উপর কোন আযাব পতিত হ'ত, তখন তারা বলত, হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট দো'আ কর, যা (কবুলের) ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনু ইস্রাঈলদের অবশ্যই পাঠিয়ে দেব'। 'অতঃপর যখন আমরা তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিতাম নির্দিষ্ট একটা সময়ে, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছানো উদ্দেশ্য হ'ত, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত' *(আ'রাফ ৭/১৩৪-৩৫)*। এই নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, যার প্রায় সবই ধারণা প্রসূত। অতএব আমরা তা থেকে বিরত রইলাম।

এ ব্যাপারে কুরআনে একটি মৌলিক বক্তব্য এসেছে এভাবে যে,

فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوْسَى وَمَن مَّعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- (الأعراف ١٣١)-

'যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসত, তখন তারা বলত যে, এটাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। পক্ষান্তরে অকল্যাণ উপস্থিত হ'লে তারা মূসা ও তার সাথীদের 'অলক্ষুণে' বলে অভিহিত করত। জেনে রাখ যে, তাদের অলক্ষুণে চরিত্র

আল্লাহ্‌র ইলমে রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৩১)*। এতে বুঝা যায় যে, একটা গযব শেষ হওয়ার পর শুভদিন আসতে এবং পিছনের ভয়াবহ দুর্দশার কথা ভুলতে ও পুনরায় গর্বে স্ফীত হ’তে নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ’ত। আমরা পূর্বেই ঐতিহাসিক বর্ণনায় জেনেছি যে, জাদুকরদের সাথে পরীক্ষার পর মূসা (আঃ) বিশ বছরের মত মিসরে ছিলেন। তারপরে সাগর ডুবির গযব নাযিল হয়। অতএব জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার পর হ’তে সাগর ডুবি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ সহ আয়াতে বর্ণিত আটটি গযব নাযিল হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুনযির যে বলেছেন যে, প্রতিটি আযাব শনিবারে এসে পরের শনিবারে চলে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হ’ত কথাটি তাই মেনে নেওয়া মুশকিল বৈ-কি।

২য় নিদর্শন : তূফান

দুর্ভিক্ষের পরে মূসা (আঃ)-এর দো‘আর বরকতে পুনরায় ভরা মাঠ ও ভরা ফসল পেয়ে ফেরাঊনী সম্প্রদায় পিছনের সব কথা ভুলে যায় ও গর্বে স্ফীত হয়ে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে থাকে। তারা সাধারণ লোকদের ঈমান গ্রহণে বাধা দিতে থাকে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তাদের উপরে গযব আকারে প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস নেমে আসে। যা তাদের মাঠ-ঘাট, বাগান-ফসল, ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তারা আবার মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আবার তারা ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা করে ও আল্লাহ্‌র নিকটে দো‘আ করার জন্য মূসা (আঃ)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ফলে মূসা (আঃ) দো‘আ করেন ও আল্লাহ্‌র রহমতে তূফান চলে যায়। পুনরায় তারা জমি-জমা আবাদ করে ও অচিরেই তা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। এ দৃশ্য দেখে তারা আবার অহংকারী হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে, আসলে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যেই প্লাবন এসেছিল, আর সেকারণেই আমাদের ফসল এবার সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ও বাম্পার ফলন হয়েছে। আসলে আমাদের কর্ম দক্ষতার ফল হিসাবে এটাই উপযুক্ত। এভাবে তারা অহংকারে মত্ত হয়ে আবার শুরু করল বনী ইস্রাঈলদের উপরে যুলুম-অত্যাচার। ফলে নেমে এল তৃতীয় গযব।

৩য় নিদর্শন : পঙ্গপাল

একদিন হঠাৎ হাযার হাযার পঙ্গপাল কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ফেরাঊনীদের সব ফসল খেয়ে ছাফ করে গেল। তারা তাদের বাগ-বাগিচার ফল-ফলাদি খেয়ে সাবাড় করে ফেলল। এমনকি কাঠের দরজা-জানালা, আসবাব-পত্র পর্যন্ত খেয়ে শেষ করল। অথচ পাশাপাশি বনু ইস্রাঈলদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সবই সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাঊনী সম্প্রদায় ছুটে এসে মূসা (আঃ)-এর কাছে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকে, যাতে গযব চলে যায়। তারা এবার পাকা ওয়াদা করল যে, তারা ঈমান আনবে ও বনু ইস্রাঈলদের মুক্তি দেবে। মূসা (আঃ) দো‘আ করলেন ও আযাব চলে গেল। পরে ফেরাঊনীরা দেখল যে, পঙ্গপালে খেয়ে গেলেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। ফলে তারা আবার শয়তানী ধোঁকায় পড়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল ও পূর্বের ন্যায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন শুরু করল। ফলে নেমে এল পরবর্তী গযব ‘উকুন’।

৪র্থ নিদর্শন : উকুন

‘উকুন’ সাধারণতঃ মানুষের মাথার চুলে জন্মে থাকে। তবে এখানে ব্যাপক অর্থে ঘুণ পোকা ও কেড়ি পোকাকেও গণ্য করা হয়েছে। যা ফেরাঊনীদের সকল প্রকার কাঠের খুঁটি, দরজা-জানালা, খাট-পালংক ও আসবাব-পত্রে এবং খাদ্য-শস্যে লেগেছিল। তাছাড়া দেহের সর্বত্র সর্বদা উকুনের কামড়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এভাবে উকুন ও ঘুণপোকার অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে এক সময় তারা কাঁদতে কাঁদতে মূসা (আঃ)-এর দরবারে এসে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং প্রতিজ্ঞার পরে প্রতিজ্ঞা করে বলতে লাগলো যে, এবারে আযাব ফিরে গেলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে, তাতে বিন্দুমাত্র অন্যথা হবে না। মূসা (আঃ) তাদের জন্য দো‘আ করলেন এবং আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল এবং পূর্বের ন্যায় অবাধ্য আচরণ শুরু করল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বারবার অবকাশ দেওয়াকে তারা তাদের ভালত্বের পক্ষে দলীল হিসাবে মনে করতে লাগল এবং হেদায়াত দূরে থাক, তাদের অহংকার ক্রমে বাড়তে লাগল। মূলতঃ এগুলো ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অবস্থা। নইলে সাধারণ মানুষ মূসা ও হারূণের দাওয়াত অন্তরে কবুল করে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি

পাচ্ছিল। আর এতেই ছিল মূসা (আঃ)-এর সান্ত্বনা। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا- (الإسراء ١٦)- ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে উক্ত জনগোষ্ঠীর উপরে আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে সমূলে বিধ্বস্ত করি’ *(ইসরা ১৭/১৬)*। ফেরাঊনীদের উপরে সেই অবস্থা এসে গিয়েছিল। তাদের নেতারা স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা তাদের লোকদের বুঝাতে লাগলো যে, এসবই মূসার জাদুর খেল। আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই। ফলে নেমে এল এবার ‘ব্যাঙ’-এর গযব।

৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ

বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও দয়ালু আল্লাহ তাদের সাবধান করার জন্য ও আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় গযব পাঠালেন। এবার এল ব্যাঙ। ব্যাঙে ব্যাঙে ভরে গেল তাদের ঘর-বাড়ি, হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, বিছানা-পত্তর সবকিছু। বসতে ব্যাঙ, খেতে ব্যাঙ, চলতে ব্যাঙ, গায়ে-মাথায় সর্বত্র ব্যাঙের লাফালাফি। কোন জায়গায় বসা মাত্র শত শত ব্যাঙের নীচে তলিয়ে যেতে হ’ত। এই নরম জীবটির সরস অত্যাচারে পাগলপরা হয়ে উঠল পুরা ফেরাঊনী জনপদ। অবশেষে কান্নাকাটি করে ও কাকুতি-মিনতি করে তারা এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো মূসা (আঃ)-এর কাছে। এবার পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, আযাব চলে যাবার সাথে সাথে তারা ঈমান আনবেই। কিন্তু না, যথা পূর্বং তথা পরং। ফলে পুনরায় গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এবারে এল ‘রক্ত’।

৬ষ্ঠ নিদর্শন : রক্ত

তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য চরমে উঠলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল ‘রক্ত’। খাদ্য ও পানপাত্রে রক্ত, কূয়া ও পুকুরে রক্ত, তরি-তরকারিতে রক্ত, কলসি-বালতিতে রক্ত। একই সাথে খেতে বসে বনু ইস্রাঈলের থালা-বাটি স্বাভাবিক। কিন্তু ফেরাঊনী ক্বিবতীর থালা-বাটি রক্তে ভরা। পানি মুখে নেওয়া মাত্র গ্লাসভর্তি রক্ত। অহংকারী নেতারা বাধ্য হয়ে বনু ইস্রাঈলী মযলূমদের

বাড়ীতে এসে খাদ্য ও পানি ভিক্ষা চাইত। কিন্তু যেমনি তাদের হাতে তা পৌঁছত, অমনি সেগুলো রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যেত। ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। না খেয়ে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। অবশেষে পূর্বের ন্যায় আবার এসে কান্নাকাটি। মূসা (আঃ) দয়া পরবশে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু ঐ নেতাগুলো পূর্বের মতই তাদের গোমরাহীতে অনড় রইল এবং ঈমান আনলো না। এদের এই হঠকারিতা ও কপট আচরণের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে, فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ-(الأعراف ١٣٣)- ‘অতঃপর তারা আত্মম্ভরিতা দেখাতে লাগলো। বস্তুতঃ এরা ছিল পাপাসক্ত জাতি’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৩)*। ফলে নেমে এল এবার প্লেগ মহামারী।

৭ম নিদর্শন : প্লেগ

রক্তের আযাব উঠিয়ে নেবার পরও যখন ওরা ঈমান আনলো না, তখন আল্লাহ ওদের উপরে প্লেগ মহামারী প্রেরণ করেন *(আ‘রাফ ৭/১৩৪)*। অনেকে এটাকে ‘বসন্ত’ রোগ বলেছেন। যাতে অল্প দিনেই তাদের সত্তর হাযার লোক মারা যায়। অথচ বনু ইস্রাঈলরা ভাল থাকে। এলাহী গযবের সাথে সাথে এগুলি ছিল মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযা এবং নবুঅতের নিদর্শন। কিন্তু জাহিল ও আত্মগর্বী নেতারা একে ‘জাদু’ বলে তাচ্ছিল্য করত।

প্লেগের মহামারীর ফলে ব্যাপক প্রাণহানিতে ভীত হয়ে তারা আবার এসে মূসা (আঃ)-এর নিকটে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগল। মূসা (আঃ) আবারও তাদের জন্য দো‘আ করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা পূর্বের ন্যায় আবারো ওয়াদা ভঙ্গ করল। ফলে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ- وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيْمَ- (يونس ٩٦-٩٧)- ‘নিশ্চয়ই যাদের উপরে তোমার প্রভুর আদেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা কখনো বিশ্বাস আনয়ন করে না, যদিও সব রকমের নিদর্শনাবলী তাদের নিকটে পৌছে যায়, এমনকি তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে’ *(ইউনুস ১০/৯৬-৯৭)*।

৮ম নিদর্শন : সাগর ডুবি

ক্রমাগত পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন কোন জাতি সম্বিত ফিরে পায় না। বরং উল্টা তাদের অহংকার বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে ওঠে, তখন তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَّلاَ تَخْشَى- (طه ٧٧)-

‘আমরা মূসার প্রতি এই মর্মে অহী করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্ধারণ কর। পিছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং (পানিতে ডুবে যাওয়ার) ভয় কর না’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭৭)*।

আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে মূসা (আঃ) রাত্রির সূচনা লগ্নে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে রওয়ানা হ’লেন। তাঁরা সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সমুদ্র কোনটা ছিল এ ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ শফী তাফসীর রূহুল মা‘আনীর বরাত দিয়ে ৮৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘ভূমধ্যসাগর’।[৩০] একই তাফসীরে ৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ‘লোহিত সাগর’। কিন্তু মাওলানা মওদূদী খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER -এর বরাতে লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদ’। মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাভীও (মৃঃ ১৯৪০ খৃঃ) বলেন যে, লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাঊনের লাশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাওয়া গিয়েছিল’।[৩১] যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া যায়।[৩২]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো জন পুত্র মিসরে এসেছিলেন। পরবর্তী চারশত বছরে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়ে ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ছয় লাখ ৩০ হাযার ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা মওদূদী বলেন, ঐ সময় মিসরে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি।[৩৩] তবে কুরআন ও হাদীছ থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল।

---

৩০. *ঐ, তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৮৬০।*
৩১. *তাফসীর জাওয়াহের (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি) ৬/৮৪ তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্রঃ।*
৩২. *দ্রঃ মওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বঙ্গানুবাদ) ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬, ৫/৯৮-৯৯ পৃঃ।*
৩৩. *রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৫৫০ পৃঃ।*

নবুঅত-পরবর্তী ৩য় পরীক্ষা ও নাজাত লাভ

মূসার নবুঅতী জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা। ইবরাহীমের অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় এটিও ছিল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মহা পরীক্ষা। পিছনে ফেরাঊনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর। এই কঠিন সময়ে বনু ইস্রাঈলের আতংক ও হাহাকারের মধ্যেও মূসা ছিলেন স্থির ও নিষ্কম্প। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্র রহমত কামনা করেন। হিজরতের রাতে একইরূপ জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

যাই হোক ফেরাঊন খবর জানতে পেরে তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল। আল্লাহ বলেন,

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ- فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ- قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ- فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ- وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ- (الشعراء ٦٠-٦٦)-

'সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল' *(শো'আরা ২৬/৬০)*। 'অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) বলল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 'আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম' *(৬১)*। 'তখন মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন'*(৬২)*। 'অতঃপর আমরা মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল'*(৬৩)*। 'ইতিমধ্যে আমরা সেখানে অপরদলকে (অর্থাৎ ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনীকে) পৌঁছে দিলাম'*(৬৪)*। 'এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম'*(৬৫)*। 'অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম' *(শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)*।

এখানে 'প্রত্যেক ভাগ' বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারোটি ভাগ বলেছেন। প্রত্যেক ভাগের লোকেরা পানির দেওয়াল ভেদ করে পরস্পরকে দেখতে পায় ও কথা বলতে পারে, যাতে তারা ভীত না হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি এগুলো কল্পনা না করলেও চলে। বরং উপরে বর্ণিত কুরআনী বক্তব্যের উপরে ঈমান আনাই যথেষ্ট। সাড়ে ছয় লক্ষ লোক এবং

তাদের সওয়ারী ও গবাদি পশু ও সাংসারিক দ্রব্যাদি নিয়ে নদী পার হবার জন্য যে বিরাট এলাকা প্রয়োজন, সেই এলাকাটুকু বাদে দু'পাশে দু'ভাগে যদি সাময়িকভাবে পানি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সেটাতে বিশ্বাস করাই শ্রেয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকার সাগরে যে 'সুনামী' (TSUNAMI) হয়ে গেল, তাতে ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ দীর্ঘ সময় যাবত দাঁড়িয়ে ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই মূসার যামানায় সাগর বিদীর্ণ হয়ে তলদেশ থেকে দু'পাশে পানি দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। আল্লাহ্‌র হুকুমে সবকিছুই হওয়া সম্ভব।

মূসা ও বনু ইস্রাঈলকে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে দেখে ফেরাঊন সরোষে ঘোড়া দাবড়িয়ে সর্বাগ্রে শুষ্ক সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনে তার বিশাল বাহিনীর সবাই সাগরের মধ্যে নেমে এলো। যখন তারা সাগরের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'দিক থেকে বিপুল পানি রাশি ধেয়ে এসে তাদেরকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ বলেন, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ- (طه ٧٨)- 'অতঃপর ফেরাঊন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল' *(ত্বোয়াহা ২০/৭৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- (يونس ٩٠)-

'আর বনু ইস্রাঈলকে আমরা সাগর পার করে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা বশতঃ। অতঃপর যখন সে (ফেরাঊন) ডুবতে লাগল, তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি এ বিষয়ে যে, সেই সত্তা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যার উপরে ঈমান এনেছে বনু ইস্রাঈলগণ এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন' *(ইউনুস ১০/৯০)*। আল্লাহ বললেন,

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ- (يونس ٩١-٩٢)-

آلْآنَ 'এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে'। 'অতএব আজ আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিচ্ছি। যাতে তোমার পশ্চাদ্বর্তীদের জন্য তুমি নিদর্শন হ'তে পার। বস্তুতঃ বহু লোক এমন রয়েছে যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিষয়ে বেখবর' *(ইউনুস ১০/৯১-৯২)*।

স্মর্তব্য যে, সাগরডুবির দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পরেও ভীত-সন্ত্রস্ত বনু ইস্রাঈলীরা ফেরাঊন মরেছে কি-না বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন। তখন আল্লাহ তার প্রাণহীন দেহ বের করে দিলেন। অতঃপর মূসার সাথীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, ফেরাঊনের মমিকৃত দেহ অক্ষতভাবে পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে এবং বর্তমানে তা মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ফেরাঊনের সময় মিসরীয় সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। তাদের সময়ে লাশ 'মমি' করার মত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়। পিরামিড, স্ফিংক্স হাযার হাযার বছর ধরে আজও সেই প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করে আছে, যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আজকের যুগের কোন কারিগর প্রাচীন এসব কারিগরী কলা-কৌশলের ধারে-কাছেও যেতে পারবে কি-না সন্দেহ।

আশূরার ছিয়াম :

ফেরাঊনের সাগরডুবি ও মূসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল ছিয়াম পালন করেন। এই ছিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও এ ছিয়াম চালু ছিল। নবুঅত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন। ২রা হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার ছিয়াম মুসলমানদের জন্য 'ফরয' ছিল। এরপরে এটি নফল ছিয়ামে পরিণত হয়।[৩৫] হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের এ ছিয়াম পালন করতে দেখে

---

৩৪. হাদীছুল ফুতূন, তাফসীর ইবনু কাছীর, ত্বোয়াহা ৩৯।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬৯ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই মূসা (আঃ)-এর নাজাতে শুকরিয়া আদায় করার অধিক হকদার। আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ তারিখে (অর্থাৎ ৯ ও ১০ দু’দিন) ছিয়াম পালন করব’।[৩৬] অন্য হাদীছে ১০ ও ১১ দু’দিন ছিয়াম পালনের কথাও এসেছে।[৩৭] অতএব নাজাতে মূসার শুকরিয়া আদায়ের নিয়তে নফল ছিয়াম হিসাবে ১০ তারিখ সহ উক্ত দু’দিন অথবা কেবল ১০ই মুহাররম তারিখে আশূরার ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এ ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবার কথা হাদীছে এসেছে।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, ১০ই মুহাররম তারিখে পৃথিবীতে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ন্যায় ৬১ হিজরী সনে হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সেজন্য নফল ছিয়াম পালনের বা কোন অনুষ্ঠান বা দিবস পালনের বিধান ইসলামে নেই। অতএব আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ত হবে ‘নাজাতে মূসার শুকরিয়া’ হিসাবে, ‘শাহাদাতে হোসায়েন-এর শোক’ হিসাবে নয়। এরূপ নিয়ত করলে নেকীর বদলে গোনাহ হবে।

বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য :

আল্লাহ বলেন,

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ- (الأعراف ١٣٦-١٣٧)-

‘ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে (অর্থাৎ ফেরাঊনীদের কাছ থেকে) বদলা নিলাম ও তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমাদের নিদর্শন সমূহকে ও তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল’। ‘আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হ’ত, তাদেরকে আমরা উত্তরাধিকার দান

৩৬. মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪১, ২০৬৭।
৩৭. বায়হাক্বী ৪/২৮৭; মির‘আত ৭/৪৬।
৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, ‘ছওম’ অধ্যায় ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬।

করলাম সেই ভূখণ্ডের পূর্বের ও পশ্চিমের, যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি এবং এভাবে পূর্ণ হয়ে গেল তোমার প্রভুর (প্রতিশ্রুত) কল্যাণময় বাণীসমূহ বনু ইস্রাঈলীদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিলাম সে সবকিছু, যা তৈরী করেছিল ফেরাঊন ও তার সম্প্রদায় এবং যা কিছু তারা নির্মাণ করেছিল' *(আ'রাফ ৭/১৩৬-১৩৭)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফূট হয়। (১) অহংকার ও সীমালংঘনের কারণে ফেরাঊন ও তার সাথীদেরকে ডুবিয়ে মারা হয় এবং তাদের সভ্যতার সুউচ্চ নির্মাণাদি ধ্বংস হয় (২) আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও ফেরাউনের যুলুমে ধৈর্যধারণের পুরস্কার হিসাবে বনু ইস্রাঈলগণকে উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের উপরে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। (৩) এখানে الَّذِينَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُونَ 'যাদেরকে হীন মনে করা হয়েছিল' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে জাতির বা যে ব্যক্তির সহায় থাকেন, বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে লোকেরা তাদের দুর্বল ভেবে বসে। কিন্তু আসলে তারা মোটেই হীন ও দুর্বল নয়। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। এখানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরাঊন সবল হ'লেও আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ অবশেষে বিজয়ী হয়েছে। এ কারণে হযরত হাসান বছরী বলেন, অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হ'ল তার মুকাবিলা না করে ছবর করা। কেননা যখন সে যুলুমের পাল্টা যুলুমের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, আল্লাহ তখন তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপরে ছেড়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন সে তার মুকাবিলায় ছবর করে এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য রাস্তা খুলে দেন'।

বনু ইস্রাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর পরামর্শে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিল, رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালেম কওমের ফেৎনায় নিক্ষেপ করো না'। 'এবং আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি

দাও’ *(ইউনুস ১০/৮৫-৮৬)*। বস্ততঃ আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এবং যথাসময়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়েই কি বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে প্রত্যাবর্তন করল এবং ফেরাঊনের অট্টালিকা সমূহ ধ্বংস করে ফেরাঊনী রাজত্বের মালিক বনে গেল? এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ ঐসময় মিসরে ফিরে যাননি। বরং তাঁরা আদি বাসস্থান কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। অতঃপর পথিমধ্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান কেন‘আন দখল করার জন্য। সেখানে তখন আমালেক্বাদের রাজত্ব ছিল। যারা ছিল বিগত ‘আদ বংশের লোক এবং বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নবী মূসার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তথাপি তারা ভীত হয় এবং জিহাদে যেতে অস্বীকার করে। শক্তিশালী ফেরাঊন ও তার বিশাল বাহিনীর চাক্ষুস ধ্বংস দেখেও তারা আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করতে পারেনি। ফলে আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত জেলখানায় তারা ৪০ বছর অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থাতেই হারূণ ও মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মূসা (আঃ)-এর শিষ্য ও পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে তারা জিহাদে অগ্রসর হয় এবং তার মাধ্যমে আমালেক্বাদের হারিয়ে কেন‘আন দখল করে তারা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে আসে। এভাবে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সূরা আ‘রাফ ১৩৬-৩৭ আয়াত ছাড়াও শো‘আরা ৫৯, ক্বাছাছ ৫ ও দুখান ২৫-২৮ আয়াত সমূহে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের পরিত্যক্ত সম্পদ সমূহের মালিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের ন্যায় বাগ-বাগিচা ও ধন-সম্পদের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা যরূরী নয়। বরং

অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হ'তে পারে। সূরা আ'রাফের আলোচ্য ১৩৭ আয়াতে 'যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি' বলে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। একই বাক্য সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতেও বলা হয়েছে। সেকারণ ক্বাতাদাহ বলেন, উপরোক্ত মর্মের সকল আয়াতে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে গিয়ে বনু ইস্রাঈলগণ দুনিয়াবী শান-শওকতের মালিক হয়। পূর্বের ও পশ্চিমের বলে শামের চারপাশ বুঝানো হয়েছে। হ'তে পারে এ সময় মাশারেক্ব ও মাগারেব (পূর্ব ও পশ্চিম) তথা শাম ও মিসর উভয় ভূখণ্ডের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[39]

প্রশ্ন হয়, ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী সমূলে ধ্বংস হওয়ার পরও হযরত মূসা (আঃ) কেন মিসরে ফিরে গিয়ে তার সিংহাসন দখল করে বনু ইস্রাঈলের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন না? এর জবাব **প্রথমতঃ** এটাই যে, এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পাননি। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁর দূরদর্শিতায় হয়ত এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দ্বীনের বিজয় সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য রাজনৈতিক সীমানা শর্ত নয়; বরং তা অঞ্চলগত সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র প্রচার আবশ্যক। তাই তিনি মিসর এলাকায় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন শেষে এবার শাম এলাকায় দ্বীন প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। **তৃতীয়তঃ** এটা হ'তে পারে যে, নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের মূল ব্যক্তি হযরত ইয়াকূব (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের জন্মস্থান শাম এলাকার বরকতমণ্ডিত অঞ্চলে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ব্যয় করার সুপ্ত বাসনা তাঁর মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁর মৃত্যুর জন্য কেন'আনের মাটিকেই নির্ধারিত করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে একটি লাল ঢিবি দেখিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর কবর নির্দেশ করেছিলেন।[৪০]

---

৩৯. *টীকা: মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) ৩২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ সাগরডুবি থেকে মুক্তি লাভের পর মিসরে আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু ৯৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ফেরাঊন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি। ... এর পরেও ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈলগণ কোন সময় দলবদ্ধভাবে জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছিল।]*

৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, *মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা'* অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সাগরডুবি থেকে নাজাত পাবার পর মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ তখনই মিসরে ফিরে যাননি। বরং তারা কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শামে যাত্রাপথে এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হ’তে হয়। এক্ষণে আমরা সেদিকে মনোনিবেশ করব।

বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা সমূহের বিবরণ:

১. মূর্তি পূজার আবদার

বনু ইস্রাঈল কওম মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযার বলে লোহিত সাগরে নির্ঘাত ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাঊনী গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ’তেই তারা এমন এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের পূজা-অর্চনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হ’ল এবং মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল, اجْعَـــل لَّنَـــا إِلَـــهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ‘তাদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি বানিয়ে দিন’। মূসা বললেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ‘তোমরা দেখছি মূর্খতায় লিপ্ত জাতি’। তিনি বলেন, إِنَّ هَــؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُــونَ ‘এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, তা সব বাতিল’। ‘তিনি আরও বললেন, أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَـــــهاً ‘আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য সন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৮-১৪০)*।

বস্তুতঃ মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত। ফলে নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের অসীলা কল্পনা করে নিজেদের হাতে গড়া দৃশ্যমান মূর্তি সমূহের পূজা-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে।

মক্কার মুশরিকরাও শেষনবীর কাছে তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্র নৈকট্যের অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল' *(যুমার ৩৯/৩)*। তাদের এই অজুহাত অগ্রাহ্য হয় এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসহ পরবর্তীকালের সকল জিহাদ মূলতঃ এই শিরকের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে কা'বা গৃহ ছাফ করেন এবং আয়াত পাঠ করেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 'সত্য এসে গেল, মিথ্যা বিদূরিত হ'ল' *(ইসরা ১৭/৮১)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! মূর্তিপূজার সে স্থান আজ দখল করেছে মুসলমানদের মধ্যে কবর পূজা, ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ, স্থানপূজা, শহীদ মিনার ও বেদী পূজা, শিখা ও আগুন পূজা ইত্যাদি। বস্তুতঃ এগুলি স্পষ্ট শিরক, যা থেকে নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সাবধান করেছেন। মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে তাদের মূর্খতাসুলভ আচরণের জন্য ধমকানোর পর তাদের হুঁশ ফিরলো এবং তারা বিরত হ'ল।

তওরাত লাভ :

অতঃপর আল্লাহ মূসাকে অহীর মাধ্যমে ওয়াদা করলেন যে, তাকে সত্বর 'কিতাব' (তওরাত) প্রদান করা হবে এবং এজন্য তিনি বনু ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে তাকে 'তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে' চলে আসতে বললেন *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৪)*। অতঃপর মূসা (আঃ) আগে এসে আল্লাহ্র হুকুমে প্রথমে ত্রিশ দিন ছিয়াম ও এ'তেকাফে মগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ বাড়িয়ে দেন *(আ'রাফ ৭/১৪২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই দশদিন ছিল যিলহজ্জের প্রথম দশদিন, যা অতীব বরকতময়। ইবনু কাছীর বলেন, ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন মূসার মেয়াদ শেষ হয় ও আল্লাহ্র সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ হয়। একই দিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াত নাযিল হয় *(মায়েদাহ ৩)*।=*(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ১৪২)*।

যথাসময়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। অতঃপর তাঁকে তওরাত প্রদান করলেন, যা ছিল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ

প্রদর্শনকারী *(বাক্বারাহ ২/৫৩)*। দীর্ঘ বিশ বছরের অধিককাল পূর্বে মিসর যাওয়ার পথে এই স্থানেই মূসা প্রথম আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনের ও নবুঅত লাভের মহা সৌভাগ্য লাভ করেন। আজ আবার সেখানেই বাক্যালাপ ছাড়াও এলাহী গ্রন্থ তওরাত পেয়ে খুশীতে অধিকতর সাহসী হয়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে দাবী করে বসলেন,

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَـــكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسَى صَعِقًا- فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ- (الأعراف ١٤٣)-

‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখা দাও। আমি তোমাকে স্বচক্ষে দেখব। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে (এ দুনিয়াতে) কখনোই দেখতে পাবে না। তবে তুমি (তূর) পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহ’লে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রভু উক্ত পাহাড়ের উপরে স্বীয় জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন বলল, হে প্রভু! মহা পবিত্র তোমার সত্তা! আমি তোমার নিকটে তওবা করছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*।

আল্লাহ বললেন,

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِيْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ (الأعراف ١٤٤-١٤٥)-

হে মূসা! আমি আমার ‘রিসালাত’ তথা বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে লোকদের (নবীগণের) উপরে তোমাকে বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম তা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ থাক’। ‘আর আমরা তার জন্য ফলক সমূহে লিখে দিয়েছিলাম সর্বপ্রকার উপদেশ ও সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে। অতএব

তুমি এগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব পাপাচারীদের বাসস্থান' *(আ'রাফ ৭/১৪৪-১৪৫)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তখতী বা ফলকে লিখিত অবস্থায় তাঁকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল। আর এই তখতীগুলোর নামই হ'ল 'তওরাত'।

(২) গো-বৎস পূজা :

মূসা যখন বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন তিনি হারূণ (আঃ)-কে কওমের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ৪০ দিন ছিয়াম ও ই'তেকাফে কাটানোর পরে তওরাত লাভ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তার কওম নিশ্চয়ই তার পিছে পিছে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسَى- قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى- قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ- (طه ٨٣-٨٥)- 'হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তুমি দ্রুত চলে এলে কেন?' 'তিনি বললেন, তারা তো আমার পিছে পিছেই আসছে এবং হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি খুশী হও'। আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৫)*।

একথা জেনে মূসা (আঃ) হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং দুঃখে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ- (طه ٨٦-٨٨)- ‘অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ তওরাৎ দানের প্রতিশ্রুতি) দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল (৪০ দিন) তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে? না-কি তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে’? *(৮৬)* ‘তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের উপরে ফেরাঊনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে’*(৮৭)*। ‘অতঃপর সে তাদের জন্য (সেখান থেকে) বের করে আনলো একটা গো-বৎসের অবয়ব, যার মধ্যে হাম্বা হাম্বা রব ছিল। অতঃপর (সামেরী ও তার লোকেরা) বলল, এটাই তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, যা পরে মূসা ভুলে গেছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৮৬-৮৮)*।

ঘটনা ছিল এই যে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাঊনীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মূসাকে লুকিয়ে) বনু ইস্রাঈলরা প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার নেয় এই কথা বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। দু’একদিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হ’ল না, তখন কুটবুদ্ধি ও মূসার প্রতি কপট বিশ্বাসী সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটলো যে, এর দ্বারা সে বনু ইস্রাঈলদের পথভ্রষ্ট করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে হারূণের দায়িত্বে দিয়ে নিজে আগেভাগে তূর পাহাড়ে চলে যান, তখন সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায়। সে ছিল অত্যন্ত চতুর। সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার সময় সে জিব্রীলের অবতরণ ও তার ঘোড়ার প্রতি লক্ষ্য করেছিল। সে দেখেছিল যে, জিব্রীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযতনে রেখে দেয়।

মূসা (আঃ) চলে যাবার পর সে লোকদের বলে যে, 'তোমরা ফেরাঊনীদের যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলি ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না। অতএব এগুলি একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও'। কথাটি অবশেষে হারূণ (আঃ)-এর কর্ণগোচর হয়। নাসাঈ-তে বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূণ (আঃ) সব অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে সেগুলি একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায়। হযরত হারূণ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে সবাই যখন অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করছে, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূণ (আঃ)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক- এই মর্মে আপনি দো'আ করলে আমি নিক্ষেপ করব, নইলে নয়।' হযরত হারূণ তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দো'আ করলেন। আসলে তার মুঠিতে ছিল জিব্রীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি। ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হৌক কিংবা হযরত হারূণের দো'আর ফলে হৌক- সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে। মুনাফিক সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ 'এটাই হ'ল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*।

মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে। এখন তোমরা সবাই গো-বৎসের পূজা কর'। কিছু লোক তার অনুসরণ করল। বলা হয়ে থাকে যে, বনু ইস্রাঈল এই ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে মূসা (আঃ)-এর পিছে পিছে তূর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেল।

হারূণ (আঃ) তাদেরকে বললেন, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى- (طه ٩٠-٩١)- কওম! তোমরা এই

গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল’*(৯০)*। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, ‘মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় রত থাকব’ *(ত্বোয়াহা ২০/৯০-৯১)*।

অতঃপর মূসা (আঃ) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারূণ (আঃ)ও তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করলেন।

গো-বৎস পূজার শাস্তি :

মূসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী হঠকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَـى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ... হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিজেদের উপরে যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমাদের প্রভুর নিকটে তওবা কর এবং নিজেদেরকে পরস্পরে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার নিকটে কল্যাণকর’... *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

তূর পাহাড় তুলে ধরা হ’ল :

এরপরেও কপট বিশ্বাসী ও হঠকারী কিছু লোক থাকে, যারা তওরাতকে মানতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের মাথার উপরে আল্লাহ তূর পাহাড়ের একাংশ উঁচু করে ঝুলিয়ে ধরেন এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা সবাই আনুগত্য করতে স্বীকৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَـا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- (البقرة ٦٣)-

‘আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপরে তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদের

যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তা মযবুতভাবে ধারণ কর এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা স্মরণে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/৬৩)*। কিন্তু গো-বৎসের মহব্বত এদের হৃদয়ে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এতকিছুর পরেও তারা শিরক ছাড়তে পারেনি। আল্লাহ বলেন, وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 'কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস প্রীতি পান করানো হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যেমন কেউ সরাসরি শিরকে নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউবা মুখে তওবা করলেও অন্তরে পুরোপুরি তওবা করেনি। কেউবা শিরককে ঘৃণা করতে পারেনি। কেউ বা মনে মনে ঘৃণা করলেও বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিল এবং বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। আল্লাহ যখন তূর পাহাড় তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেন, তখনও তাদের কেউ কেউ (পরবর্তীতে) বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যদিও অমান্য করলাম কথাটি ছিল পরের এবং তা প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বাস্তব ক্রিয়াকর্মে। যেমন আল্লাহ এইসব প্রতিশ্রুতি দানকারীদের পরবর্তী আচরণ সম্বন্ধে বলেন,

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ- (البقرة ٦٤)-

'অতঃপর তোমরা উক্ত ঘটনার পরে (তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে গেছ। যদি আল্লাহ্র বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ তোমাদের উপরে না থাকত, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে' *(বাক্বারাহ ২/৬৪)*।

সামেরীর কৈফিয়ত :

সম্প্রদায়ের লোকদের শাস্তি দানের পর মূসা (আঃ) এবার সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?' 'সে বলল, আমি দেখলাম, যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জিব্রীলের) পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা (আগুনে গলিত অলংকারের অবয়বের প্রতি) নিক্ষেপ করলাম। আমার মন এটা করতে প্ররোচিত করেছিল (অর্থাৎ কারু পরামর্শে নয় বরং নিজস্ব চিন্তায়

ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় আমি একাজ করেছি)’। ‘মূসা বললেন, দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এই শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি, ‘আমাকে কেউ স্পর্শ করো না’ এবং তোর জন্য (আখেরাতে) একটা নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে (অর্থাৎ জাহান্নাম), যার ব্যতিক্রম হবে না। এক্ষণে তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই সর্বদা পূজা দিয়ে ঘিরে থাকতিস। আমরা ওটাকে (অর্থাৎ কৃত্রিম গো-বৎসটাকে) অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব এবং অবশ্যই ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছিটিয়ে দেব’ *(ত্বোয়াহা ৯৫-৯৭)*।

সামেরী ও তার শাস্তি :

পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। পরে মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। অত্যন্ত চতুর এই ব্যক্তিটি পরে কপট বিশ্বাসী ও মুনাফিক হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না পাওয়ায় সে বনু ইস্রাঈলদের সাথে সাগর পার হওয়ার সুযোগ পায়। মূসা (আঃ)-এর বিপুল নাম-যশ ও অলৌকিক ক্ষমতায় সে তার প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পরায়ণ ছিল। মূসার সান্নিধ্য ও নিজস্ব সুক্ষ্মদর্শিতার কারণে সে জিব্রাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের কারণেই সাগর পার হওয়ার সময় সে জিব্রীলকে চিনতে পারে ও তার ঘোড়ার পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে। তার ধারণা ছিল যে, মূসার যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হ’ল এই ফেরেশতা। অতএব তার স্পর্শিত মাটি দিয়ে সেও এখন মূসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মূসা (আঃ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহ্‌র হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা (আঃ)-এর বদদো‘আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত’ *(কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৯৫)*। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে

উঠতো لاَ مِسَاسَ ‘আমাকে কেউ স্পর্শ করো না’। বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ডের চাইতে এটিই ছিল কঠিন শাস্তি। যা দেখে অপরের শিক্ষা হয়। বলা বাহুল্য, আজও ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে গো-মাতার পূজা অব্যাহত রয়েছে। যদিও উদারমনা উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমেই এ অলীক বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং গাভীকে দেবী নয় বরং মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও খাদ্যযোগ্য প্রাণী হিসাবে বিশ্বাস করেন।

কুরতুবী বলেন, এর মধ্যে দলীল রয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদ‘আতী ও পাপাচারী ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা যরূরী। তাদের সঙ্গে কোনরূপ মেলামেশা ও আদান-প্রদান না করাই কর্তব্য। যেমন আচরণ শেষনবী (ছাঃ) জিহাদ থেকে পিছু হটা মদীনার তিনজন ধনীলোকের সাথে (তাদের তওবা কবুলের আগ পর্যন্ত) করেছিলেন *(কুরতুবী)*।

(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি :

মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে তওরাৎ প্রাপ্ত হয়ে বনু ইস্রাঈলের কাছে ফিরে এসে তা পেশ করলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব। তোমরা এর অনুসরণ কর। তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলে উঠলো, যদি আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বলে দেন যে, এটি তাঁর প্রদত্ত কিতাব, তাহ’লেই কেবল আমরা বিশ্বাস করব, নইলে নয়। হতে পারে তুমি সেখানে চল্লিশ দিন বসে বসে এটা নিজে লিখে এনেছ। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে তাঁর সাথে তূর পাহাড়ে যেতে বললেন। বনু ইস্রাঈলরা তাদের মধ্যে বাছাই করা সত্তর জনকে মনোনীত করে মূসা (আঃ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে প্রেরণ করল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বকর্ণে শুনতে পেল। এরপরেও তাদের অবাধ্য মন শান্ত হ’ল না। শয়তানী ধোঁকায় পড়ে তারা নতুন এক অজুহাত তুলে বলল, এগুলো আল্লাহ্র কথা না অন্য কারু কথা, আমরা বুঝবো কিভাবে? অতএব যতক্ষণ আমরা তাঁকে সশরীরে প্রকাশ্যে আমাদের সম্মুখে না দেখব, ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না যে, এসব আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু যেহেতু এ পার্থিব জগতে চর্মচক্ষুতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা কারু নেই, তাই তাদের এই চরম ধৃষ্টতার জবাবে আসমান থেকে ভীষণ এক নিনাদ এল, যাতে সব নেতাগুলোই চোখের পলকে অক্কা পেল।

অকস্মাৎ এমন ঘটনায় মূসা (আঃ) বিস্মিত ও ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! এমনিতেই ওরা হঠকারী। এরপরে এদের এই মৃত্যুতে লোকেরা আমাকেই দায়ী করবে। কেননা মূল ঘটনার সাক্ষী কেউ থাকল না আমি ছাড়া। অতএব হে আল্লাহ! ওদেরকে পুনর্জীবন দান কর। যাতে আমি দায়মুক্ত হ’তে পারি এবং ওরাও গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আল্লাহ মূসার দো‘আ কবুল করলেন এবং ওদের জীবিত করলেন। এ ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে-

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ- ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- (البقرة ٥٥-٥٦)-

‘আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! কখনোই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন তোমাদেরকে পাকড়াও করল এক ভীষণ নিনাদ (বজ্রপাত), যা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছিল’। ‘অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*।

(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ :

সাগরডুবি থেকে মুক্তি পাবার পর হ’তে সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে তূর পাহাড়ে পৌঁছা পর্যন্ত সময়কালে মূর্তিপূজার আবদার, গো-বৎস পূজা ও তার শাস্তি, তওরাৎ লাভ ও তা মানতে অস্বীকার এবং তূর পাহাড় উঠিয়ে ভয় প্রদর্শন, আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি প্রভৃতি ঘটনা সমূহের পর এবার তাদের মূল গন্তব্যে যাত্রার জন্য আদেশ করা হ’ল।

অবাধ্য জাতিকে তাদের আদি বাসস্থানে রওয়ানার প্রাক্কালে মূসা (আঃ) তাদেরকে দূরদর্শিতাপূর্ণ উপদেশবাণী শুনান এবং যেকোন বাধা সাহসের সাথে অতিক্রম করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিগত দিনে আল্লাহ্র অলৌকিক সাহায্য লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভয়বাণী শুনান। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِينَ- يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُـــوْا خَاسِــــرِيْنَ- (المائدة ٢٠-٢١)-

'আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বস্তু দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি'। 'হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরে) প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর তোমরা পশ্চাদদিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/২০-২১)*।

পবিত্র ভূমির পরিচিতি :

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম অর্থাৎ সিরিয়া অঞ্চল পবিত্র ভূমির অন্তর্গত। আমাদের রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শাম পবিত্র ভূমি হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।[৪১] আবহাওয়াগত দিক দিয়ে সিরিয়া প্রাচীন কাল থেকেই শস্য-শ্যামল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে খ্যাত। জাহেলী যুগে মক্কার ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত ভাবে ইয়ামন ও সিরিয়ায় যথাক্রমে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ব্যবসায়িক সফরে অভ্যস্ত ছিল। বলা চলে যে, এই দু'টি সফরের উপরেই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করত। সূরা কুরায়েশ-য়ে এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতে এই এলাকাকে بَارَكْنَـــا حَوْلَـــهُ বা 'বরকতময় এলাকা' বলে অভিহিত করেছেন। এর বরকত সমূহ ছিল দ্বিবিধ: ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় দিকে বরকতের কারণ ছিল এই যে, এ অঞ্চলটি হ'ল, ইবরাহীম, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা (আঃ) সহ কয়েক হাযার নবীর জন্মস্থান, বাসস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুস্থান। মূসা (আঃ)-এর জন্ম মিসরে হ'লেও তাঁর মৃত্যু হয় এখানে এবং তাঁর কবর হ'ল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। নিকটবর্তী তীহ্ প্রান্তরে মূসা, হারূণ, ইউশা' প্রমুখ নবী বহু বৎসর

৪১. বুখারী, তিরমিযী, আবুদাউদ, আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৬২৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭১, ৭২ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়, 'ইয়ামন, শাম ও ওয়ায়েস কুরনীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১৩।

ধরে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁদের প্রচারের ফল অন্ততঃ এটুকু ছিল এবং এখনও আছে যে, আরব উপদ্বীপে কোন নাস্তিক বা কাফির নেই।

অতঃপর পার্থিব বরকত এই যে, সিরিয়া অঞ্চল ছিল চিরকাল উর্বর এলাকা। এখানে রয়েছে অসংখ্য ঝরণা, বহমান নদ-নদী এবং অসংখ্য ফল-ফসলের বাগ-বাগিচা সমূহ। বিভিন্ন সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বলা যায় অতুলনীয়। একটি হাদীছে এসেছে, দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করবে কিন্তু চারটি মসজিদে পৌঁছতে পারবে না; বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে তূর’।[৪২]

মূসা (আঃ)-এর আগমনকালে বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম এলাকা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ছিল। তারা ছিল কওমে ‘আদ-এর একটি শাখা গোত্র। দৈহিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট। তাদের সাথে যুদ্ধ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ দিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর মিসরে হিজরতের পর কেন‘আন সহ শাম এলাকা আমালেক্বাদের অধীনস্থ হয়। আয়াতে বর্ণিত ‘রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন’ বাক্যটি ভবিষ্যদ্বাণী হ’তে পারে, যার সম্পর্কে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট থেকে নিশ্চিত ওয়াদা পেয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল যে, তারা জিহাদ করে কেন‘আন দখল করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে জিহাদে অগ্রসর হ’লে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। যেভাবে ফেরাঊনের বিরুদ্ধে তারা অলৌকিক বিজয় অর্জন করেছিল মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

অতঃপর ‘তাদেরকে এমন সব বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বের কাউকে দেওয়া হয়নি’ বলতে তাদের দেওয়া ধর্মীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব উভয়কে বুঝানো হয়েছে, যা একত্রে কাউকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। এটাও ভবিষ্যদ্বাণী হ’তে পারে, যা তাদের বংশের পরবর্তী নবী দাঊদ ও সুলায়মানের সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাদের সময়েও এটা সম্ভব ছিল, যদি নাকি তারা নবী মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু হতভাগারা তা পারেনি বলেই বঞ্চিত হয়েছিল।

---

৪২. আহমদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্, শারহুস সুন্নাহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৩৪।

নবুঅত-পরবর্তী ৪র্থ পরীক্ষা : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলকে আমালেক্বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাম দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, শামের ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে *(মায়েদাহ ৫/২১)*। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এইসব বিলাসী কাপুরুষেরা আল্লাহ্র কথায় দৃঢ় বিশ্বাস আনতে পারেনি।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর থেকে শাম অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। যথা সময়ে তাঁরা জর্দান নদী পার হয়ে 'আরীহা' (أريحة) পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। এটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম মহানগরী সমূহের অন্যতম, যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যা আজও স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। মূসা (আঃ)-এর সময়ে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

শিবির স্থাপনের পর মূসা (আঃ) বিপক্ষ দলের অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ১২ জন সর্দারকে প্রেরণ করলেন। যারা ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো পুত্রের বংশধরগণের 'বারোজন প্রতিনিধি, যাদেরকে তিনি আগেই নির্বাচন করেছিলেন স্ব স্ব গোত্রের লোকদের দেখাশুনার জন্য' *(মায়েদাহ ৫/১২)*। তারা রওয়ানা হবার পর বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে বিপক্ষ দলের বিশালদেহী বিকট চেহারার একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে লোকটির নাম 'আউজ ইবনে ওনুক' (عوج بن عنق) বলা হয়েছে এবং তার আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসের অতিরঞ্জিত বর্ণনা সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যাই হোক উক্ত ব্যক্তি একাই বনু ইস্রাঈলের এই বার জন সরদারকে পাকড়াও করে তাদের বাদশাহ্র কাছে নিয়ে গেল এবং অভিযোগ করল যে, এই লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতলব নিয়ে এসেছে। বাদশাহ তার নিকটতম লোকদের সাথে পরামর্শের পর এদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এই উদ্দেশ্যে যে, এরা গিয়ে তাদের নেতাকে আমালেক্বাদের জাঁক-জমক ও শৌর্য-বীর্যের স্বচক্ষে দেখা কাহিনী বর্ণনা করবে। তাতে ওরা ভয়ে এমনিতেই পিছিয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, বাদশাহ্র ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। এই ভীত-

কাপুরুষ সর্দাররা জিহাদ দূরে থাক, ওদিকে তাকানোর হিম্মতও হারিয়ে ফেলেছিল।

বনু ইস্রাঈলের বারো জন সর্দার আমালেক্বাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে এল এবং আমালেক্বাদের বিস্ময়কর উন্নতি ও অবিশ্বাস্য শক্তি-সামর্থ্যের কথা মূসা (আঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করল। কিন্তু মূসা (আঃ) এতে মোটেই ভীত হননি। কারণ তিনি আগেই অহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। সেমতে তিনি গোত্রনেতাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আমালেক্বাদের শৌর্য-বীর্যের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ইউশা‘ বিন নূন ও কালেব বিন ইউক্বেন্না ব্যতীত বাকী সর্দাররা গোপনে সব ফাঁস করে দিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ফলে যা হবার তাই হ’ল। এই ভীতু আরামপ্রিয় জাতি একেবারে বেঁকে বসলো।

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ- (المائدة ٢٢)-

‘তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা সেখানে প্রবেশ করব’ *(মায়েদাহ ৫/২২)*। অর্থাৎ ওরা চায় যে, মূসা (আঃ) তার মু‘জেযার মাধ্যমে যেভাবে ফেরাঊনকে ডুবিয়ে মেরে আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন, অনুরূপভাবে আমালেক্বাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের পরিত্যক্ত অট্টালিকা ও সম্পদরাজির উপরে আমাদের মালিক বানিয়ে দিন। অথচ আল্লাহ্র বিধান এই যে, বান্দাকে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরা এক পাও বাড়াতে রাযী হয়নি। এমতাবস্থায়

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- (المائدة ٢٣)-

‘তাদের মধ্যকার দু’জন আল্লাহভীরু ব্যক্তি (সম্ভবতঃ পূর্বের দু’জন সর্দার হবেন, যাদের মধ্যে ইউশা‘ পরে নবী হয়েছিলেন), যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, (মূসা (আঃ)-এর আদেশ মতে) ‘তোমরা

ওদের উপর আক্রমণ করে (শহরের মূল) দরজায় প্রবেশ কর। (কেননা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে,) যখনই তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*।

কিন্তু ঐ দুই নেককার সর্দারের কথার প্রতি তারা দৃকপাত করল না। বরং আরও উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوْا فِيهَا، فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ– (المائدة ٢٤)– 'হে মূসা! আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা যাও এবং যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানেই বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। নবীর অবাধ্যতার ফলস্বরূপ এই জাতিকে ৪০ বছর তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে বন্দী থাকতে হয় *(মায়েদাহ ৫/২৬)*। অতঃপর এইসব দুষ্টমতি নেতাদের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধররা হযরত ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্দখল করে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

বনু ইস্রাঈলের এই চূড়ান্ত বেআদবী ছিল কুফরীর নামান্তর এবং অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধের সময়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছুটা অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অল্প সংখ্যক সবেমাত্র মুহাজির মুসলমানের মোকাবেলায় তিনগুণ শক্তিসম্পন্ন সুসজ্জিত বিরাট কুরায়েশ সেনাবাহিনীর আগমনে হতচকিত ও অপ্রস্তুত মুসলমানদের বিজয়ের জন্য যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, তখন মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আনছারী (রাঃ) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কস্মিনকালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা (আঃ)-এর স্বজাতি তাঁকে বলেছিল, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ– 'তুমি ও তোমার প্রভু যাও যুদ্ধ করগে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা আপনার ডাইনে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন'। বিপদ মুহূর্তে সাথীদের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।[৪৩]

৪৩. মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৬৬।

মিসর থেকে হিজরতের কারণ :

ইউসুফ হ’তে মূসা পর্যন্ত দীর্ঘ চার/পাঁচশ’ বছর মিসরে অবস্থানের পর এবং নিজেদের বিরাট জনসংখ্যা ছাড়াও ফেরাঊনীদের বহু সংখ্যক লোক গোপনে অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মূসা (আঃ)-এর মত শক্তিশালী একজন নবীকে পাওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে কেন রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে পালিয়ে আসতে হ’ল? অতঃপর পৃথিবীর কোথাও তারা আর স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারেনি, তার একমাত্র কারণ ছিল ‘জিহাদ বিমুখতা’। এই বিলাসী, ভীরু ও কাপুরুষের দল ‘ফেরাঊন ও তার দলবলের ভয়ে এতই ভীত ছিল যে, তাদের নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করত না। বরং মূসা (আঃ)-এর কাছে পাল্টা অভিযোগ তুলতো যে, তোমার কারণেই আমরা বিপদে পড়ে গেছি’। যেমন সূরা আ‘রাফ ১২৯ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ‘অথচ ঐ সময় মিসরে মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছিল’।[৪৪]

মিসর থেকে বেরিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নগরী দখলের জন্যও তাদেরকে যখন জিহাদের হুকুম দেওয়া হ’ল, তখনও তারা একইভাবে পিছুটান দিল। যার পরিণতি তারা সেদিনের ন্যায় আজও ভোগ করছে। বস্তুতঃ বিলাসী জাতি ভীরু হয় এবং জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

শিক্ষণীয় বিষয় :

মূসা (আঃ)-এর জীবনের এই শেষ পরীক্ষায় দৃশ্যতঃ তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে অনুমিত হ’লেও প্রকৃত অর্থে তিনি ব্যর্থ হননি। বরং তিনি সকল যুগের ঈমানদারগণকে জানিয়ে গেছেন যে, কেবল মু‘জেযা বা কারামত দিয়ে দ্বীন বিজয়ী হয় না। তার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাসী একদল মুমিনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আর এটাই হ’ল জিহাদ। ৪০ বছর পর যখন তারা পুনরায় জিহাদে নামল, তখনই তারা বিজয়ী হ’ল। যুগে যুগে এটাই সত্য হয়েছে।

বাল‘আম বা‘ঊরার ঘটনা :

ফিলিস্তীন দখলকারী ‘জাব্বারীন’ তথা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতারা মূসা (আঃ) প্রেরিত ১২ জন প্রতিনিধিকে ফেরৎ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত

৪৪. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০।

থাকতে পারেনি। কারণ তারা মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযার কারণে ফেরাঊনের সসৈন্যে সাগরডুবির খবর আগেই জেনেছিল। অতএব মূসা (আঃ)-এর বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান বন্ধ করার জন্য তারা বাঁকা পথ তালাশ করল। তারা অত্যন্ত গোপনে বনু ইস্রাঈলের ঐ সময়কার একজন নামকরা সাধক ও দরবেশ আলেম বাল‘আম ইবনে বা‘ঊরার (بلعم بن باعوراء) কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ লোক পাঠাল। বাল‘আম তার স্ত্রীর অনুরোধে তা গ্রহণ করল। অতঃপর তার নিকটে আসল কথা পাড়া হ’ল যে, কিভাবে আমরা মূসার অভিযান ঠেকাতে পারি। আপনি পথ বাৎলে দিলে আমরা আরও মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি আপনাকে প্রদান করব। বাল‘আম উঁচুদরের আলেম ছিল। যে সম্পর্কে তার নাম না নিয়েই আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ- (الأعراف ١٧٥)-

‘আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সেই লোকটির অবস্থা, যাকে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। আর তার পিছনে লাগল শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৫)*।

কথিত আছে যে, বাল‘আম ‘ইসমে আযম’ জানত। সে যা দো‘আ করত, তা সাথে সাথে কবুল হয়ে যেত। আমালেক্বাদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে মূসার বিরুদ্ধে দো‘আ করল। কিন্তু তার জিহ্বা দিয়ে উল্টা দো‘আ বের হ’তে লাগল যা আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। তখন সে দো‘আ বন্ধ করল। কিন্তু অন্য এক পৈশাচিক রাস্তা সে তাদের বাৎলে দিল। সে বলল, বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে দিতে পারলে আল্লাহ তাদের উপরে নারায হবেন এবং তাতে মূসার অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে’। আমালেক্বারা তার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে বনু ইস্রাঈলের নেতাদের সেবাদাসী হিসাবে অতি গোপনে পাঠিয়ে দিল। বড় একজন নেতা এফাঁদে পা দিল। আস্তে আস্তে তা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হ’ল। ফলে আল্লাহ্র গযব নেমে এল। বনু ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্লেগ মহামারী

দেখা দিল। কথিত আছে যে, একদিনেই সত্তর হাযার লোক মারা গেল। এ ঘটনায় বাকী সবাই তওবা করল এবং প্রথম পথভ্রষ্ট নেতাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে রাস্তার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হ’ল। অতঃপর আল্লাহ্র গযব উঠে গেল। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা।=(*কুরতুবী ও ইবনু কাছীর উভয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে। আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, ঘটনার কিছু সারবত্তা রয়েছে। যদিও সত্য বা মিথ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। - লেখক*)।

সম্ভবতঃ সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা, শঠতা ও পাপাচারে অতিষ্ঠ হ’য়ে এবং একসাথে এই বিরাট জনশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় মূসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণ :

মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ বনু ইস্রাঈলগণকে মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ বছরের জন্য বন্দী করা হয়। তাদের অবাধ্যতায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে নবী মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِيْنَ- (المائدة ٢٥)-

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি কোন ক্ষমতা রাখি না কেবল আমার নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর ব্যতীত। অতএব আপনি আমাদের ও পাপাচারী কওমের মধ্যে ফায়ছালা করে দিন’ *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। জবাবে আল্লাহ বলেন,

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ- (المائدة ٢٦)-

‘এদেশটি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ শামদেশ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হ’ল। এ সময় তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব তুমি অবাধ্য কওমের জন্য দুঃখ করো না’ *(মায়েদাহ ৫/২৬)*। تَاهَ يَتِيْهُ تِيْهًـــا অর্থ গর্ব করা, পথ হারিয়ে ঘোরা ইত্যাদি। এখান থেকেই উক্ত প্রান্তরের নাম হয়েছে

'তীহ্' (تِيْـــهِ)। বস্তুতঃ এই উন্মুক্ত কারাগারে না ছিল কোন প্রাচীর, না ছিল কোন কারারক্ষী। তারা প্রতিদিন সকালে উঠে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'ত। আর সারাদিন চলার পর রাতে আবার সেখানে এসেই উপস্থিত হ'ত, যেখান থেকে সকালে তারা রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু কোনভাবেই তারা অদৃশ্য কারা প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারত না। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হতবুদ্ধি অবস্থায় দিগ্বিদিক ঘুরে এই হঠকারী অবাধ্য জাতি তাদের দুনিয়াবী শাস্তি ভোগ করতে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য কওম দুনিয়াবী শাস্তি হিসাবে প্লাবণে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বস্তুতঃ চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হারূণ ও মূসা (আঃ)-এর তিন বছরের বিরতিতে মৃত্যু হয়। অতঃপর শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী নবী ইউশা' বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস জয়ে সমর্থ হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে। বর্ণিত হয়েছে যে, ১২ জন নেতার মধ্যে ১০ জন অবাধ্য ও ভীরু নেতা এরি মধ্যে মারা যায় এবং মূসার অনুগত ইউশা' ও কালেব দুই নেতাই কেবল বেঁচে থাকেন, যাদের হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজিত হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর মায়েদাহ ২৬)*।

তীহ্ প্রান্তরের ঘটনাবলী :

নবীর সঙ্গে যে বেআদবী তারা করেছিল, তাতে আল্লাহ্র গযবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক হয়ত এ জাতিকে আরও পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহপুষ্ট একটি জাতি নিজেদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ফলে কিভাবে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎগ্রস্ত হয় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার শিকার হয়, পৃথিবীর মানুষের নিকটে দৃষ্টান্ত হিসাবে তা পেশ করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে দৃষ্টান্ত হয়েছে ফেরাঊন একজন অবাধ্য ও অহংকারী নরপতি হিসাবে। আর তাই বনু ইস্রাঈলের পরীক্ষার মেয়াদ আরও বর্ধিত হ'ল। নিম্নে তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কিছু নিদর্শন বর্ণিত হ'ল।-

১. মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান :

ছায়াশূন্য তপ্ত বালুকা বিস্তৃত মরুভূমিতে কাঠফাটা রোদে সবচেয়ে প্রয়োজন যেসব বস্তুর, তন্মধ্যে 'ছায়া' হ'ল সর্বপ্রধান। হঠকারী উম্মতের অবাধ্যতায়

ত্যক্ত-বিরক্ত মূসা (আঃ) দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্র নিকটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। দয়ালু আল্লাহ তাঁর দো‘আ সমূহ কবুল করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর বিশেষ রহমত সমূহ নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে একটি হ’ল উন্মুক্ত তীহ্ প্রান্তরের উপরে শামিয়ানা সদৃশ মেঘমালার মাধ্যমে শান্তিদায়ক ছায়া প্রদান করা। যেমন আল্লাহ্ এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَـــامَ ‘স্মরণ কর সে কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ছায়া দান করেছিলাম মেঘমালার মাধ্যমে’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

২. ঝর্ণাধারার প্রবাহ :

ছায়ার পরেই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হ’ল পানি। যার অপর নাম জীবন। পানি বিহনে তৃষ্ণার্ত পিপাসার্ত উম্মতের আহাজারিতে দয়া বিগলিত নবী মূসা স্বীয় প্রভুর নিকটে কাতর কণ্ঠে পানি প্রার্থনা করলেন। কুরআনের ভাষায়,

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ- (البقرة ٦٠)-

‘আর মূসা যখন স্বীয় জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে আঘাত কর। অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে এলো (১২টি গোত্রের জন্য) ১২টি ঝর্ণাধারা। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল (অর্থাৎ মূসার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিল) নিজ নিজ ঘাট। (আমি বললাম,) তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক খাও আর পান কর। খবরদার যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না’ *(বাক্বারাহ ২/৬০)*।

বস্তুতঃ ইহুদী জাতি তখন থেকে এযাবত পৃথিবী ব্যাপী ফাসাদ সৃষ্টি করেই চলেছে। তারা কখনোই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি।

৩. মান্না ও সালওয়া খাদ্য পরিবেশন :

মরুভূমির বুকে চাষবাসের সুযোগ নেই। নেই শস্য উৎপাদন ও বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ। কয়েকদিনের মধ্যেই মওজুদ খাদ্য শেষ হয়ে

গেলে হাহাকার পড়ে গেল তাদের মধ্যে। নবী মূসা (আঃ) ফের দো'আ করলেন আল্লাহ্র কাছে। এবার তাদের জন্য আসমান থেকে নেমে এলো জান্নাতী খাদ্য 'মান্না ও সালওয়া'- যা পৃথিবীর আর কোন নবীর উম্মতের ভাগ্যে জুটেছে বলে জানা যায় না।

'মান্না' এক প্রকার খাদ্য, যা আল্লাহ তা'আলা বনু ইস্রাঈলদের জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন। আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর 'সালওয়া' হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি।[৪৫] প্রথমটি দিয়ে রুটি ও দ্বিতীয়টি দিয়ে গোশতের অভাব মিটত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ 'কামআহ হ'ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত'।[৪৬] এতে বুঝা যায় 'মান্ন' কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে 'কামআহ' অর্থ করা হয়েছে 'মাশরূম' (Mashroom)। আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্ন একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য। যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। 'সালওয়া' একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা ঐসময় সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরূম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। তবে মাশরূম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কয়েক লাখ বনু ইস্রাঈল কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস। সব মিলে তারা পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে ও ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।[৪৭] অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো সিরিয়ার তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। ঈসার সাথী হাওয়ারীগণ এটা চেয়েছিল *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*। কিন্তু পেয়েছিল কি-না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

---

৪৫. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭।*
৪৬. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৬৯ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায়।*
৪৭. *বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ই,ফা,বা, ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০।*

দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের খাবার, এ এক অকল্পনীয় অনির্বচনীয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই হতভাগারা তাতেও খুব বেশীদিন খুশী থাকতে পারেনি। তারা গম, তরকারি, ডাল-পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। যেমন আল্লাহ বলেন,

... وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَـــكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- (البقرة ٥٧)-

‘... আমরা তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’। (আমরা বললাম) এসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর (কিন্তু ওরা শুনল না, কিছু দিনের মধ্যেই তা বাদ দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য নিম্নমানের খাদ্য খাবার জন্য যিদ ধরলো)। বস্তুতঃ (এর ফলে) তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوْسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّـــا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ؟ إِهْبِطُوْا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَـــيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ- (البقرة ٦١)-

‘যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যের উপরে কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। কাজেই তুমি তোমার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য-শস্য দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়; যেমন তরি-তরকারি, কাকুড়, গম, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি। মূসা বললেন, তোমরা উত্তম খাদ্যের বদলে এমন খাদ্য পেতে চাও যা নিম্নস্তরের? তাহ’লে তোমরা অন্য কোন শহরে চলে যাও। সেখানে তোমরা তোমাদের চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পাবে’ *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

৪. পার্শ্ববর্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম ও আল্লাহ্র অবাধ্যতা :

বনু ইস্রাঈলগণ যখন জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী খাদ্য খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যিদ ধরে বসলো, তখন আল্লাহ তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদে যেতে বললেন। যেখানে তাদের চাহিদামত খাদ্য-শস্যাদি তারা সর্বদা প্রাপ্ত হবে। উক্ত জনপদে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য তিনি কতগুলি আদব ও শিষ্টাচার মান্য করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـــذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ- (البقرة ٥٨)-

'আর যখন আমরা বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ কর এবং নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদা কর ও বলতে থাক (হে আল্লাহ!) 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'- তাহ'লে আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আমরা সত্বর অতিরিক্তভাবে আরও দান করব' *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*। কিন্তু এই অবাধ্য জাতি এতটুকু আনুগত্য প্রকাশ করতেও রাযী হয়নি। তাদেরকে শুকরিয়ার সিজদা করতে বলা হয়েছিল এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চেয়ে 'হিত্ত্বাহ' (حطة) অর্থাৎ حُط ذنوبنا অথবা احطط عنا ذنوبنا حطــة 'আমাদের পাপসমূহ পুরোপুরি মোচন করুন' বলতে বলতে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেআদবীর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারা হিত্ত্বাহ-এর বদলে 'হিন্ত্বাহ' (حنطة) অর্থাৎ 'গমের দানা' বলতে বলতে এবং সিজদা বা মাথা নীচু করার পরিবর্তে পিছন দিকে পিঠ ফিরে প্রবেশ করল।[৪৮] এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পূজারীর বদলে পেটপূজারী বলে প্রমাণ করল।

এখানে هــذه القريــة বা 'এই নগরী' বলতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যার ব্যাখ্যা মায়েদাহ ২১ আয়াতে এসেছে, الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ বলে।

৪৮. *বুখারী হা/৩৪০৩ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*

তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বিজয় লাভ করে ও নগরীতে প্রবেশ করে *(ইবনু কাছীর)*। এভাবে তাদের দীর্ঘ বন্দীত্বের অবসান ঘটে।

অথচ যদি প্রথমেই তারা মূসার হুকুম মেনে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হ’ত, তাহ’লে তখনই তারা বিজয়ী হয়ে নগরীতে প্রবেশ করত। কিন্তু নবীর অবাধ্যতা করার কারণেই তাদের ৪০ বছর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ’ল। পরিশেষে তাদেরকে সেই জিহাদই করতে হ’ল, যা তারা প্রথমে করেনি ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে। বস্তুতঃ ভীরু ব্যক্তি ও জাতি কখনো সম্মানিত হয় না। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উক্ত প্রধান ফটককে আজও ‘বাব হিত্ত্বাহ’ (باب حطة) বলা হয়ে থাকে *(কুরতুবী)*।

আল্লাহ বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْاْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْاْ يَفْسُقُوْنَ- (البقرة ٥٩)-

‘অতঃপর যালেমরা সে কথা পাল্টে দিল, যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। ফলে আমরা যালেমদের উপর তাদের অবাধ্যতার কারণে আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম’ *(বাক্বারাহ ২/৫৯)*। তবে সেটা যে কি ধরনের গযব ছিল, সে বিষয়ে কুরআন পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব। তবে সাধারণতঃ এগুলি প্লেগ-মহামারী, বজ্রনিনাদ, ভূমিকম্প প্রভৃতি হয়ে থাকে। যা বিভিন্ন নবীর অবাধ্য উম্মতদের বেলায় ইতিপূর্বে হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

হিনত্বাহ ও হিত্ত্বাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী দু’প্রকার মানুষের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদীরা বস্তু পাওয়ার লোভে মানবতাকে ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ধার্মিক ও আদর্শবাদীরা তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য বস্তুকে উৎসর্গ করে। ফলে মানবতা রক্ষা পায় ও মানব সভ্যতা স্থায়ী হয়। বাস্তবিক পক্ষে সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে বস্তুবাদীগণ মানবতার ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানের ইরাক ও আফগানিস্তানে স্রেফ তেল লুটের জন্য তথাকথিত গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতাদের হুকুমে

টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ বনু আদমের হত্যাকাণ্ড এরই প্রমাণ বহন করে। অথচ কেবলমাত্র ধর্মই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখে।

তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন :

ইহুদীরা তাদের এলাহী কিতাব তওরাতের শাব্দিক পরিবর্তন নবী মূসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমন করেছিল, অর্থগত পরিবর্তনও তারা করেছিল। যেমন মূসা (আঃ) যখন তাদের ৭০ জন নেতাকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গযবে মৃত্যুবরণ করে পুনরায় তাঁর রহমতে জীবিত হয়ে ফিরে এল, তখনও এই গর্বিত জাতি তওরাত যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত গ্রন্থ এ সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে একথাও জুড়ে দিল যে, আল্লাহ তা'আলা সবশেষে একথাও বলেছেন যে, তোমরা যতটুকু পার, আমল কর। আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দিব'। অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা। তাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে লোকেরা বলে দিল যে, তওরাতের বিধান সমূহ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তখনই আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতাগণ তূর পাহাড়ের একাংশ উপরে তুলে ধরে তাদের হুকুম দিলেন, হয় তোমরা তওরাত মেনে নাও, না হয় ধ্বংস হও। তখন নিরুপায় হয়ে তারা তওরাত মেনে নেয়।[৪৯]

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তওরাত, যবূর ও ইঞ্জীল গ্রন্থগুলিতে তারা অসংখ্য শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে এই কিতাবগুলি আসল রূপে কোথাও আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। ইহুদীদের তওরাত পরিবর্তনের ধরন ছিল তিনটি। এক. অর্থ ও মর্মগত পরিবর্তন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। দুই. শব্দগত পরিবর্তন যেমন আল্লাহ বলেন, مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، 'ইহুদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যারা আল্লাহ্র কালামকে (যেখানে শেষনবীর আগমন সংবাদ ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে) তার স্বস্থান হ'তে পরিবর্তন করে দেয়' *(নিসা ৪/৪৬; মায়েদাহ ৫/১৩, ৪১)*। এই পরিবর্তন তারা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে শাব্দিকভাবে এবং মর্মগতভাবে উভয়বিধ প্রকারে করত। 'এভাবে তারা কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে (মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) পরিবর্তন করত। পরিবর্তনের এ

৪৯. *দ্রঃ বাক্বারাহ ২/৬৩, ৯৩; আ'রাফ ৭/১৭১*।

প্রকারগুলি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে’।[৫০]

আল্লাহ্‌র কিতাবের এইসব পরিবর্তন তাদের মধ্যকার আলেম ও যাজক শ্রেণীর লোকেরাই করত, সাধারণ মানুষ যাদেরকে অন্ধ ভক্তির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هَـــذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً– (البقرة ٧٩)–

‘ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলত, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ হয়েছে- যাতে এর বিনিময়ে তারা সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে’ *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلســـُّحْتِ ‘এইসব লোকেরা মিথ্যা কথা শোনাতে এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত’ *(মায়েদাহ ৫/৪২)*। জনগণ তাদের কথাকেই সত্য ভাবত এবং এর বিপরীত কিছুই তারা শুনতে চাইত না। এভাবে তারা জনগণের রব-এর আসন দখল করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابـــاً مِّـــنْ دُونِ اللهِ ‘তারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে’ *(তওবাহ ৯/৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُـــمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَاباً– ‘তারা তাদেরকে সিজদা করতে বলত না বটে। কিন্তু মানুষকে তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজের নির্দেশ দিত এবং তারা তা মেনে নিত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ বলে আখ্যায়িত করেন’। খৃষ্টান পণ্ডিত ‘আদী বিন হাতেম যখন বললেন যে, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা আমাদের আলেম-দরবেশদের পূজা করি না’। তখন তার জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَـــرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَـــهُ ‘তারা কি আল্লাহকৃত

---

৫০. *মা‘আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩১৭ গৃহীত: তাফসীরে ওছমানী*।

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে না? আর তোমরাও কি সেটা মেনে নাও না? 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَـــادَتُهُمْ 'সেটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৫১]

গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিহ্নিত করণ :

বনু ইস্রাঈলের জনৈক যুবক তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করে তার চাচার অগাধ সম্পত্তির একক মালিক বনতে চায়। কিন্তু চাচা তাতে রাযী না হওয়ায় সে তাকে গোপনে হত্যা করে। পরের দিন বাহ্যিকভাবে কান্নাকাটি করে চাচার রক্তের দাবীদার সেজে কওমের নেতাদের কাছে বিচার দেয়। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে আসামী শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মূসা (আঃ) অহী মারফত জেনে গিয়েছিলেন যে, বাদী স্বয়ং আসামী এবং সেই-ই একমাত্র হত্যাকারী। এমতাবস্থায় সম্প্রদায়ের নেতারা এসে বিষয়টি ফায়ছালার জন্য মূসা (আঃ)-কে অনুরোধ করল। মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক যে ফায়ছালা দিলেন, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيْهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُـــوْنَ 'যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দায়ী করছিলে। অথচ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন, যা তোমরা গোপন করতে চাচ্ছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৭২)*। কিভাবে আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিলেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ:

'যখন মূসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন, জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(বাক্বারাহ ৬৭)*। 'তারা বলল, তাহ'লে আপনি আপনার পালনকর্তার নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না বকনা, বরং দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা সেরে ফেল' *(৬৮)*। 'তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে

---

৫১. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১; আহমাদ, বায়হাক্বী, ইবনু জারীর প্রমুখ।*

আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে’ *(৬৯)*। ‘লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব’ *(৭০)*। ‘তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন’। ‘তারা বলল, এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। অথচ তারা (মনের থেকে) তা যবেহ করতে চাচ্ছিল না’ *(বাক্বারাহ ২/৬৭-৭১)*।

আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর আমি বললাম, যবেহকৃত গরুর গোশতের একটি টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে তোমরা চিন্তা কর’ *(বাক্বারাহ ২/৭৩)*।

বলা বাহুল্য, গোশতের টুকরা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত লোকটি জীবিত হ’ল এবং তার হত্যাকারী ভাতিজার নাম বলে দিয়ে পুনরায় মারা গেল। ধারণা করা চলে যে, মূসা (আঃ) সেমতে শাস্তি বিধান করেন এবং হত্যাকারী ভাতিজাকে হত্যার মাধ্যমে ‘ক্বিছাছ’ আদায় করেন।

কিন্তু এতবড় একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও এই হঠকারী কওমের হৃদয় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়নি। তাই আল্লাহ বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ‘অতঃপর তোমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেল। যেন তা পাথর, এমনকি তার চেয়েও শক্ত... *(বাক্বারাহ ২/৭৪)*।

গাভী কুরবানীর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) এখানে প্রথম যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, সেটি এই যে, আল্লাহ্র উপরে পূর্ণরূপে ভরসা করলে অনেক সময় যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুর বাইরের বিষয় দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়। যেমন এখানে গরুর গোশতের টুকরা মেরে মৃতকে জীবিত

করার মাধ্যমে হত্যাকারী শনাক্ত করানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। অথচ বিষয়টি ছিল যুক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধী।

(২) মধ্যম বয়সী গাভী কুরবানীর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নৈতিকভাবে মৃত জাতিকে পুনর্জীবিত করতে হ'লে পূর্ণ নৈতিকতা সম্পন্ন ঈমানদার যুবশক্তির চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানী আবশ্যক।

(৩) নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাঁদের প্রদত্ত শারঈ বিধান সহজভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। বিতর্কে লিপ্ত হ'লে বিধান কঠোর হয় এবং আল্লাহ্র গযব অবশ্যম্ভাবী হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলগণ যদি প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন একটা গাভী যবেহ করত, তবে তাতেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু তারা যত বেশী প্রশ্ন করেছে, তত বেশী বিধান কঠোর হয়েছে। এমনকি অবশেষে হত্যাকারী চিহ্নিত হ'লেও আল্লাহ্র ক্রোধে তাদের হৃদয়গুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

(৪) এই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনাকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য আল্লাহ পাক গাভীর নামে সূরা বাক্বারাহ নামকরণ করেন। এটিই কুরআনের ২৮৬টি আয়াত সমৃদ্ধ সবচেয়ে বড় ও বরকতমণ্ডিত সূরা। এই সূরার ফযীলত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়'।[৫২] এ সূরার মধ্যে আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) রয়েছে, যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শ্রেষ্ঠতম' (اعظم) আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৩]

চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়া :

নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّـــنَ اللهِ

৫২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।*
৫৩ . *মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২।*

‘আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হ’ল এবং তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হ’ল’ *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

ইবনু কাছীর বলেন, এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রকৃতি হ’ল, ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে। এ মর্মে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّـــنَ النَّـــاسِ ‘তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হ’ল যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। তবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত’ *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। ‘আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম’ বলতে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ চিরন্তন বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন শিশু ও রমণীকুল এবং এমন সাধক ও উপাসকগণ, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে থাকেন। এরা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর ‘মানব প্রদত্ত মাধ্যম’ হ’ল, অন্যের সাথে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা, যা মুসলমান বা অন্য যেকোন জাতির সাথে হ’তে পারে। যেমন বর্তমানে তারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তি বলয়ের সাথে গাটছড়া বেঁধে টিকে আছে।

ইহুদীদের উপর চিরস্থায়ী গযব নাযিলের ব্যাপারে সূরা আ‘রাফে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- (الأعراف ١٦٧)-

‘স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (ইহুদীদের) উপরে প্রেরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন সব শাসক, যারা তাদের প্রতি পৌঁছাতে থাকবে কঠিন শাস্তি সমূহ। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু দ্রুত বদলা গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৭)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আমরা ইহুদীদের উপরে বিগত ও বর্তমান যুগের লাঞ্ছনা ও অবমাননার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হাযার বছর ধরে বসবাসকারী

ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অশুভ শক্তি বলয়ের মাধ্যমে যবরদস্তি মূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'ইস্রাঈল' নামক রাষ্ট্র মূলতঃ কোন রাষ্ট্রই নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্তে রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের ঘাঁটি বা অস্ত্রগুদাম মাত্র। বৃহৎ শক্তিগুলো হাত গুটিয়ে নিলে তারা একমাসও নিজের শক্তিতে টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এতেই কুরআনী সত্য حَبْــلٍ مِّــنَ النَّــاسِ বা 'মানব প্রদত্ত মাধ্যম'-এর বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়। ইনশাআল্লাহ এ মাধ্যমও তাদের ছিন্ন হবে এবং তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে অথবা ইসলাম কবুল করে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

মূসা ও খিযিরের কাহিনী :

এ ঘটনাটি বনু ইস্রাঈলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বড় বড় নবী-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর জীবনে এটাও ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ হ'তে[৫৪] এবং সূরা কাহফ ৬০ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত হ'ল।-

ঘটনার প্রেক্ষাপট :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহ্র

---

৫৪. বুখারী হা/৪৭২৫-২৭ প্রভৃতি; 'তাফসীর' অধ্যায় ও অন্যান্য; মুসলিম, হা/৬১৬৫ 'ফাযায়েল' অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ।

পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, ‘আল্লাহই সর্বাধিক অবগত’। আল্লাহ তাঁকে বললেন, ‘হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী’। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি’। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের (সম্ভবতঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে সফরে বেরিয়ে পড়। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে’। মূসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা‘ বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু’জন ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা‘ ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে বললেন। তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন এবং বললেন যে, ‘শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল’ *(কাহফ ১৮/৬৩)*। তখন মূসা (আঃ) বললেন, ঐ স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল।

ফলে তাঁরা আবার সেপথে ফিরে চললেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তাকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, এদেশে সালাম? কে আপনি? বললেন, আমি বনু ইস্রাঈলের মূসা। আপনার কাছ থেকে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন’।

খিযির বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মূসা! আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি। পক্ষান্তরে আপনাকে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি’। মূসা

বললেন, ‘আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না’ *(কাহফ ১৮/৬৯)*। খিযির বললেন, ‘যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি’।

(১) অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় তাতে ছিদ্র করে দিলেন। শারঈ বিধানের অধিকারী নবী মূসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবেই অন্যায়। তিনি বলেই ফেললেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন’। তখন খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, ‘আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না’। মূসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, علمي و علمك و علم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره ‘আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য’।[৫৫]

(২) তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিযির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা আৎকে উঠে বললেন, একি! একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্তবড় গোনাহের কাজ’। খিযির বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না’। মূসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, ‘এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন করি, তাহ’লে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না’ *(কাহফ ১৮/৭৫)*।

---

৫৫. *বুখারী হা/৪৭২৭*।

(৩) ‘অতঃপর তারা চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন’। খিযির বললেন هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ‘এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হ’ল। এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি’ *(কাহফ ১৮/৭৮)*।

তাৎপর্য সমূহ :

প্রথমতঃ নৌকা ছিদ্র করার বিষয়। সেটা ছিল কয়েকজন মিসকীন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা এ দিয়ে সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ছিদ্র করে দিলাম এজন্য যে, ঐ অঞ্চলে ছিল এক যালেম বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে লোকদের নৌকা ছিনিয়ে নিত’। নিশ্চয়ই ছিদ্র নৌকা সে নিবে না। ফলে দরিদ্র লোকগুলি নৌকার সামান্য ত্রুটি সেরে নিয়ে পরে তাদের কাজে লাগাতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বালকটিকে হত্যার ব্যাপার। তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে বড় হয়ে অবাধ্য হবে ও কাফের হবে। যা তার বাপ-মায়ের জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি চাইলাম যে, দয়ালু আল্লাহ তার পিতা-মাতাকে এর বদলে উত্তম সন্তান দান করুন, যে হবে সৎকর্মশীল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। যে তার পিতা-মাতাকে শান্তি দান করবে’।

তৃতীয়তঃ পতনোন্মুখ প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার ব্যাপার। উক্ত প্রাচীরের মালিক ছিল নগরীর দু’জন পিতৃহীন বালক। ঐ প্রাচীরের নীচে তাদের নেককার পিতার রক্ষিত গুপ্তধন ছিল। আল্লাহ চাইলেন যে, বালক দু’টি যুবক হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি খাড়া থাক এবং তারা তাদের প্রাপ্য গুপ্তধন হস্তগত করুক। (খিযির বলেন,) وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ ‘বস্তুতঃ আমি নিজ ইচ্ছায় এ সবের কিছুই করিনি’ *(কাহফ ১৮/৮২)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) বড় যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কারু উপরে ছোট-খাট যুলুম করা যায়। যেমন নৌকা ছিদ্র করা থেকে এবং বালকটিকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয়। তবে শরী'আতে মুহাম্মাদীতে এগুলি সবই সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মত বিষয় একমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত বিচার কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কারু জন্য অনুমোদিত নয়। (২) পিতা-মাতার সৎকর্মের ফল সন্তানরাও পেয়ে থাকে। যেমন সৎকর্মশীল পিতার রেখে যাওয়া গুপ্তধন তার সন্তানরা যাতে পায়, সেজন্য খিযির সাহায্য করলেন। তাছাড়া এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মশীলগণের সন্তানদের প্রতি সকলেরই স্নেহ পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। (৩) মানুষ অনেক সময় অনেক বিষয়কে ভাল মনে করে। কিন্তু সেটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

عَسَى أَن تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْن- (البقرة ٢١٦)-

'তোমরা অনেক বিষয়কে অপসন্দ কর। অথচ সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক বিষয় তোমরা ভাল মনে কর, কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা জানেন, তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَقْضِى اللهُ للمــؤمن من قضاءٍ الا كان خــيرًا لــه 'আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্য যা ফায়ছালা করেন, তা কেবল তার মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে'।[৫৬]

(৪) অতঃপর আরেকটি মৌলিক বিষয় এখানে রয়েছে যে, মূসা ও খিযিরের এ শিহরণমূলক কাহিনীটি ছিল 'আগাগোড়া একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ'। থলের মধ্যেকার মরা মাছ জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সাগরে চলে যাওয়া যেমন সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়, তেমনি আল্লাহ পাক কোন

৫৬. *আহমাদ হা/১২৯২৯ 'সনদ ছহীহ, -আরনাঊত্ব*।

ফেরেশতাকে খিযিরের রূপ ধারণ করে মূসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। যাকে তিনি সাময়িকভাবে শরী‘আতী ইলমের বাইরে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা মূসার জ্ঞানের বাইরে ছিল। এর দ্বারা আল্লাহ মূসা সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

(৫) বান্দার জন্য যে অহংকার নিষিদ্ধ, অত্র ঘটনায় সেটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

খিযির কে ছিলেন?

কুরআনে তাঁকে عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ‘আমাদের বান্দাদের একজন’ *(কাহফ ১৮/৬৫)* বলা হয়েছে। বুখারী শরীফে তাঁর নাম খিযির (خـــضر) বলে উল্লেখ করা হয়েছে’। সেখানে তাঁকে নবী বলা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনি একজন ওলী ছিলেন এবং মৃত্যু হয়ে গেলেও এখনও মানুষের বেশ ধরে যেকোন সময় যেকোন মানুষের উপকার করেন। ফলে জঙ্গলে ও সাগর বক্ষে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আজও অনেকে খিযিরের অসীলা পাবার জন্য তার উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে। এসব ধারণার প্রসার ঘটেছে মূলতঃ বড় বড় প্রাচীন মনীষীদের নামে বিভিন্ন তাফসীরের কেতাবে উল্লেখিত কিছু কিছু ভিত্তিহীন কল্পকথার উপরে ভিত্তি করে।

যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হ’ল, খিযিরের বক্তব্য وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ‘আমি এসব নিজের মতে করিনি’ *(কাহফ ১৮/৮২)*। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্র নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশ্ফ-ইলহাম শরী‘আতের দলীল নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহ্র অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী‘আত বিরোধী কাজ করতে পারেন না। ঐ সময় শরী‘আতধারী নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। আর সে কারণেই খিযিরের শরী‘আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না, বা তাঁর কোন উম্মত ছিল না।

এখানে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই এবং তাঁকে 'আল্লাহ্র একজন বান্দা' হিসাবে গণ্য করি, যাঁকে আল্লাহ্র ভাষায় آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمـــاً 'আমরা আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ হ'তে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান' *(কাহফ ১৮/৬৫)*। তাহ'লে তিনি নবী ছিলেন কি অলী ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, এসব বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না। যেভাবে মূসার মায়ের নিকটে আল্লাহ অহী (অর্থাৎ ইলহাম) করেছিলেন এবং যার ফলে তিনি তার সদ্য প্রসূত সন্তান মূসাকে বাক্সে ভরে সাগরে নিক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)* এবং যেভাবে জিব্রীল মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাহাবীগণকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন[৫৭] একই ধরনের ঘটনা মূসা ও খিযিরের ক্ষেত্রে হওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু নয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, লোকমান অত্যন্ত উঁচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। লোকমানকে আল্লাহ যেমন বিশেষ 'হিকমত' দান করেছিলেন *(লোকমান ৩১/১২)*। খিযিরকেও তেমনি বিশেষ 'ইল্ম' দান করেছিলেন *(কাহফ ১৮/৬৫)*। এটা বিচিত্র কিছু নয়।

সংশয় নিরসন

(১) মূসা (আঃ)-এর সিন্দুক ও নবীগণের ছবি :

বাক্বারাহ ২৪৮ : إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَّأْتِيَكُمُ التَّـــابُوْتُ 'তাদের নবী (শ্যামুয়েল) তাদেরকে বললেন (ত্বালূতের) রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকটে সেই 'তাবূত' (সিন্দুক) আসবে...।'

এখানে তাবূত-এর ব্যাখ্যায় (ক) তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে, الصندوق كان فيه صور الأنبيـــاء، أنزلـــه الله علـــى أدم– 'সেই সিন্দুক, যা আল্লাহ আদম (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেন এবং যার মধ্যে রয়েছে

৫৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

নবীদের ছবিসমূহ’। (খ) তাফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে, التـــابوت هـــي صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس الهر وذنـــب كذنبـــه وجناحـــان ‘উক্ত তাবূত হ’ল একটি মূর্তি, যার মধ্যে যবরজদ ও ইয়াকূত মণি-মুক্তা সমূহ রয়েছে। উক্ত তাবূতের মাথা ও লেজ মদ্দা বিড়ালের মাথা ও লেজের ন্যায়, যার দু’টি ডানা রয়েছে।’ (গ) তাফসীর বায়যাবীতে বলা হয়েছে, وفيه صورة الأنبياء من آدم إلى محمد ‘তাতে নবীগণের ছবি রয়েছে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত।’

(ঘ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে *(পৃঃ ৬৩ টীকা ১৭০)* বলা হয়েছে, ‘বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কালে হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন’।

উপরে বর্ণিত কোন ব্যাখ্যাই কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। বরং প্রকৃত কথা এই যে, এটি হ’ল আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর তৈরী সেই সিন্দুক, যার মধ্যে তাঁর লাঠি, তাওরাত এবং তাঁর ও হারূণ (আঃ)-এর পরিত্যক্ত অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ সংরক্ষিত ছিল। বনু ইস্রাঈলগণ এটিকে বরকত হিসাবে ও বিজয়ের নিদর্শন হিসাবে মনে করত।

(২) তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহ :

<u>আ‘রাফ ১৪৫</u> : وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُـــلِّ شَيْءٍ ‘আমরা তার (মূসা) জন্য ফলকে (তাওরাতে পৃষ্ঠাসমূহে) সকল বিষয়ে উপদেশ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ লিখে দিয়েছি’। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, أي ألواح التوراة وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عـــشرة ‘অর্থাৎ তাওরাতের ফলক সমূহ, যা ছিল জান্নাতের পত্র সমূহ বা যবরজাদ অথবা যুমুর্রুদ, যা ছিল ৭টি অথবা ১০টি’। অথচ এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। ঐ ফলকগুলির সংখ্যা কত ছিল, কি দিয়ে তৈরী ছিল, কতটুকু তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল, কি দিয়ে ও কিভাবে সেখানে লেখা ছিল, এগুলি বিষয় জানা বা তার উপরে ঈমান আনার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপরে নেই। কুরআন-হাদীছ এবিষয়ে চুপ রয়েছে। আমরাও এ বিষয়ে চুপ থাকব। বস্তুতঃ এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. আল্লাহ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হ'লে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম প্রতিরোধ করেন। যেমন আল্লাহ উদ্ধত ফেরাঊনের কাছে প্রথমে মূসাকে পাঠান। ২০ বছরের বেশী সময় ধরে তাকে উপদেশ দেওয়ার পরেও এবং নানাবিধ গযব পাঠিয়েও তার ঔদ্ধত্য দমিত না হওয়ায় অবশেষে সাগরডুবির গযব পাঠিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে উৎখাত করেন।

২. দুনিয়াদার সমাজনেতারা সর্বদা যালেম শাসকদের সহযোগী থাকে। পক্ষান্তরে মযলূম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে।

৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে আখেরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত করে। যেমন দুনিয়াদার শাসক ফেরাঊন নিজেকে ও নিজের সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং নিজে এমনভাবে অপদস্থ হয়েছে যে, তার নামে কেউ নিজ সন্তানের নাম পর্যন্ত রাখতে চায় না। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর দ্বীনী আন্দোলন তাঁকে ও তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে বিশ্ব মাঝে স্থায়ী সম্মান দান করেছে।

৪. দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যালেম তার যুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়। অনুরূপভাবে মযলূম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করলে নির্দিষ্ট সময়ে তাকে সাহায্য করা হয়। অধিকন্তু পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হ'তে বিরত থাকতে হয়। মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আল্লাহ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে সবাইকে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৬. অহীর বিধানের অবাধ্যতা করলে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত জাতিও চিরস্থায়ী গযবের শিকার হ'তে পারে। বনু ইস্রাঈলগণ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা করায় তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে যায় এবং তারা চিরস্থায়ী গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি

একইভাবে প্রযোজ্য। ইস্রাঈলী দরবেশ আলেম বাল‘আম বা‘ঊরার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭. জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না। আর সেকারণেই মিসরীয় জনগণের ১০ হ’তে ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণকে রাতের অন্ধকারে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। অতঃপর জিহাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তারা তাদের পিতৃভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকারে ব্যর্থ হয়। যার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে তারা বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হয়। অবশেষে নবী ইউশা-র নেতৃত্বে জিহাদ করেই তাদের পিতৃভূমি দখল করতে হয়।

৮. সংস্কারককে জাতির নিকট থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দুনিয়ায় তাঁর নিঃস্বার্থ সঙ্গী হাতে গণা কিছু লোক হয়ে থাকে। তাঁকে স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করেই চলতে হয়। বিনিময়ে তিনি আখেরাতে পুরস্কৃত হন ও পরবর্তী বংশধরের নিকটে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। যেমন মূসার প্রকৃত সাথী ছিলেন তার ভাই হারূণ ও ভাগিনা ইউশা‘ বিন নূন। বাকী অধিকাংশ ছিল তাকে কষ্ট দানকারী ও স্বার্থপর সাথী । মূসা (আঃ) তাই দুঃখ করে তার কওমকে বলেন, لِمَ تُؤْذُوْنَنِي وَقَد تَّعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَـــيْكُمْ ‘কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল’ *(ছফ ৬১/৫)*।

উপসংহার :

মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*-এর দীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে নবীদের কাহিনীর একটা বিরাট অংশ সমাপ্ত হ’ল। হারূণ ও মূসার জীবনীতে ব্যক্তি মূসা ও গোষ্ঠী বনু ইস্রাঈলের উত্থান-পতনের যে ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও শিহরণ মূলক। একই সাথে তা মানবীয় চরিত্রের তিক্ত ও মধুর নানাবিধ বাস্তবতায় মুখর। সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সচেতন যেকোন পাঠকের জন্য এ কাহিনী হবে খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এক্ষণে আমাদের উচিত হবে এর আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া এবং গভীর ধৈর্যের সাথে আমাদের স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও জাতিকে অহি-র বিধানের আলোকে গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

১৬. হযরত ইউনুস *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনের মোট ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে[৫৮] বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে 'যুন-নূন' (ذو النون) এবং সূরা ক্বলম ৪৮ আয়াতে তাঁকে 'ছাহেবুল হূত' (صاحب الحوت) বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। সামনে তা বিবৃত হবে।

ইউনুস (আঃ)-এর কওম :

ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَـــنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (يونس ٩٨)-

---

৫৮. যথাক্রমে (১) সূরা নিসা ৪/১৬৩; (২) আন'আম ৬/৮৬; (৩) ইউনুস ১০/৯৮; (৪) আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮; (৫) ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০। সর্বমোট = ১৮টি ॥

‘অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ’ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম’ *(ইউনুস ১০/৯৮)*। অত্র আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মাছের পেটে ইউনুস :

আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ- (الصافات ١٣٩-١٤٢)-

‘আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন’। ‘যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল’। ‘অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ’ল’। ‘অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী’ *(ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)*।

আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পতিত হন।

হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্র হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা *(ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)*। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) এক ঘণ্টা ছিলেন (২) তিনি পূর্বাহ্নে প্রবেশ করে অপরাহ্নে বেরিয়ে আসেন (৩) ৩ দিন ছিলেন (৪) ৭ দিন ছিলেন (৫) ২০ দিন ছিলেন (৬) ৪০ দিন ছিলেন।[৫৯] আসলে এইসব মতভেদের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা এসবের রচয়িতা হ'ল ইহুদী গল্পকারগণ। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন।

ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন?

এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে আল্লাহ সম্মত হননি'। অথচ পুরা দৃষ্টিকোণটাই ভুল। কেননা কোন নবী থেকেই তাঁর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটির কল্পনা করা নবীগণের নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত। বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তাঁর হুকুমেই তিনি এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। আর তার কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয়।[৬০]

---

৫৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ পৃঃ; কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১৪৪।*
৬০. *দ্রঃ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬১৭-১৮।*

ইউনুস মুক্তি পেলেন :

আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ- وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقْطِيْنٍ- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ- فَآمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (الصافات ١٤٣-١٤٨)-

‘অতঃপর যদি সে আল্লাহ্‌র গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হ’ত’*(ছাফফাত ১৪৩)*। ‘তাহ’লে সে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত’? *(১৪৪)*।‘অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল’*(১৪৫)*। ‘আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম’*(১৪৬)*। ‘এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ করলাম’*(১৪৭)*। ‘তারা ঈমান আনল। ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম’ *(ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)*।

আলোচ্য আয়াতে ‘ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত’-এর অর্থ সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না। বরং মাছের পেটেই তার কবর হ’ত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান হ’ত।

অন্যত্র আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ- لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ- فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (القلم ٤٨-٥٠)-

‘তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল’। ‘যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’। ‘অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন’ *(ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০)*।

‘যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার

তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দো'আ কবুল না করতেন, তাহ'লে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা খেয়ে তিনি পুষ্টি ও শক্তি লাভ করেন। বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন বালুচরে ফেলে রাখা হ'ত, যা তার জন্য লজ্জাষ্কর হ'ত।

'অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন' অর্থ এটা নয় যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ ইউনুসকে মনোনীত করেননি; বরং এটা হ'ল বর্ণনার আগপিছ মাত্র। কুরআনের বহু স্থানে এরূপ রয়েছে। এখানে এর ব্যাখ্যা এই যে, ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

অন্যত্র ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ-(الأنبياء ٨٧-٨٨)-

'এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না'।[৬১] 'অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

---

৬১. অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এখানে অনুবাদে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। যেমন (১) বঙ্গানুবাদ তাফসীর ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে 'তিনি মনে করেছিলেন আমি তার উপর কোন ক্ষমতা রাখি না'। অথচ কোন নবী কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারেন না। এখানে অনুবাদক 'কুদরত' মাদ্দাহ থেকে শব্দার্থ করেছেন, যেটা এখানে ভুল শুধু নয় বরং অন্যায়। (২) সঊদী সরকার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনি মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না' (৩) একই মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে সঊদী সরকার প্রকাশিত উর্দূ তাফসীরে এবং (৪) আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অনুদিত ইংরেজী তাফসীরে।

ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দো‘আ ‘দো‘আয়ে ইউনুস’ নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دعوةُ ذى النون إذْ دعا رَبَّهُ وهو فى بطن الحوتِ (لآ إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إنِى كنتُ من الظالمين) لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ فى شيءٍ إلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، رواه الترمذى–

‘বিপদগ্রস্ত কোন মুসলমান যদি (নেক মকছূদ হাছিলের নিমিত্তে) উক্ত দো‘আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করেন’।[৬২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تُفَضِّلُوْا بين أنبياء الله وما يَنْبَغِيْ لعبدٍ أن يَّقولَ : إنِّي خيرٌ مِّنْ يُــوْنُسَ بْــنِ مَتَّى، متفق عليه–

‘তোমরা আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করো না। আর কোন বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে উত্তম’।[৬৩] কুরতুবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটা এজন্য বলেছেন যে, তিনি যেমন (মি‘রাজে) সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে তেমনি আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*। বস্তুতঃ এটা ছিল রাসূলের নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহ্র হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজ কওমের নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তাঁর উপরে ঈমান আনলো। ফলে পুনরায় শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।

৬২. *তিরমিযী হা/৩৭৫২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ৮৫ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২৯২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘আল্লাহ্র নাম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২।*

৬৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৯-১০, ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ- ৯।*

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।

(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

(৩) আল্লাহ্র পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেণ্ড পূর্বেও জানা যাবে না।

(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন।

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহ্র হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

(৮) বাহ্যদৃষ্টিতে কোন বস্তু খারাব মনে হ'লেও নেককার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ উত্তম ফায়ছালা করে থাকেন। যেমন লটারীতে নদীতে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিজের জন্য অতীব খারাব মনে হ'লেও আল্লাহ ইউনুসের জন্য উত্তম ফায়ছালা দান করেন ও তাকে মুক্ত করেন।

(৯) আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দো'আ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেন।

(১০) আল্লাহ্র প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। যেমন ইউনুস পরে বুঝতে পেরে আল্লাহ্র প্রতি অধিক অনুগত হন এবং এজন্য তিনি আল্লাহ্র প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল (أَوَّابٌ) বলে আল্লাহ্র প্রশংসা পান।

১৭. হযরত দাঊদ *(আলাইহিস সালাম)*

বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু’জন। তাঁরা হ’লেন পিতা ও পুত্র দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)। বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ। সেকারণ আল্লাহ তার শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّـــهُ أَوَّابٌ-(ص ١٧)- ‘তারা যেসব কথা বলে তাতে তুমি ছবর কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদকে স্মরণ কর। সে ছিল আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। দাঊদ হলেন আল্লাহ্র একমাত্র বান্দা, যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম স্বীয় বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশ করেছিলেন এবং সেমতে দাঊদের বয়স ৬০ হ’তে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়[৬৪]

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৬৫] তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী[৬৬] দাঊদ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই শক্তিশালী হননি, বরং তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং একই সাথে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। নিম্নোক্ত ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে।-

জালূত ও তালূতের কাহিনী এবং দাঊদের বীরত্ব :

সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়ে মূসা ও হারূণ (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে শামে এলেন এবং শান্তিতে বসবাস করতে থাকলেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীনে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন এবং ফিলিস্তীন দখলকারী শক্তিশালী আমালেক্বাদের সঙ্গে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে এ ওয়াদাও দিলেন যে, জিহাদে নামলেই তোমাদের

---

৬৪. *তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮, ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ-৩।*
৬৫. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/২৫১; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) মায়েদাহ ৫/৭৮; (৪) আন‘আম ৬/৮৪; (৫) ইসরা ১৭/৫৫; (৬) আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; (৭) নমল ২৭/১৫-১৬; (৮) সাবা ৩৪/১০-১১,১৩; (৯) ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬= ১০; মোট ২৩টি আয়াত।*
৬৬. *তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৯৯০।*

বিজয় দান করা হবে *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। কিন্তু এই ভীতু ও জিহাদ বিমুখ বিলাসী জাতি তাদের নবী মূসাকে পরিষ্কার বলে দিল, اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّـــكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ-(المائـــدة ٢٥)- 'তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। এতবড় বেআদবীর পরে মূসা (আঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হ'লেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই দু'ভাই পরপর তিন বছরের ব্যবধানে মৃত্যু বরণ করলেন।

জিহাদের আদেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর যাবত উন্মুক্ত কারাগারে অতিবাহিত করার পর মূসার শিষ্য ও ভাগিনা এবং পরবর্তীতে নবী ইউশা' বিন নূনের নেতৃত্বে জিহাদ সংঘটিত হয় এবং আমালেক্বাদের হটিয়ে তারা ফিলিস্তীন দখল করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তারা পুনরায় বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের উপরে পুনরায় আমালেক্বাদের চাপিয়ে দেন। বনু ইস্রাঈলরা আবার নিগৃহীত হ'তে থাকে। এভাবে বহু দিন কেটে যায়। এক সময় শ্যামুয়েল (شَمويـــل) নবীর যুগ আসে। লোকেরা বলে আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই। এই ঘটনা আল্লাহ তার শেষনবীকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ- (البقرة ٢٤٦)-

'তুমি কি মূসার পরে বনু ইস্রাঈলদের একদল নেতাকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণ করুন, যাতে আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের নির্দেশ দিলে

তোমরা লড়াই করবে? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হ’তে! অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হ’ল তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকীরা সবাই ফিরে গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদের ভাল করেই জানেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৬)*। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوْا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ-(البقرة ٢٤٧-٢٤٨)-

‘তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সেটা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপরে। অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতা পাওয়ার অধিক হকদার। তাছাড়া সে ধন-সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। জওয়াবে নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে মনোনীত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন। তিনি হ’লেন প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ’। ‘নবী তাদেরকে বললেন, তালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে (তোমাদের কাংখিত) সিন্দুকটি আসবে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ’তে তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি রূপে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারূণ ও তাদের পরিবার বর্গের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বহন করে আনবে ফেরেশতাগণ। এতেই তোমাদের (শাসকের) জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৭-২৪৮)*।

বিষয়টি এই যে, বনু ইস্রাঈলগণের নিকটে একটা সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে তাদের নবী মূসা, হারূণ ও তাঁদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে

রাখত। একবার আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধের সময় বনু ইস্রাঈলগণ পরাজিত হ'লে আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। এক্ষণে যখন বনু ইস্রাঈলগণ পুনরায় জিহাদের সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে উক্ত সিন্দুক ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর এই সিন্দুকটির মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার নিরসন করেন। সিন্দুকটি তালূতের বাড়ীতে আগমনের ঘটনা এই যে, জালূতের নির্দেশে কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে তাদের পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা একে তার প্রকৃত মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশমতে গরুর গাড়ীটিকে তাড়িয়ে এনে তালূতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বনু ইস্রাঈলগণ এই দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালূতের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালূত আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হ'লে তিনি কথিত মতে ৮০,০০০ হাযার সেনাদল নিয়ে রওয়ানা হন। ইবনু কাছীর এই সংখ্যায় সন্দেহ পোষণ করে বলেন, ক্ষুদ্রায়তন ফিলিস্তীন ভূমিতে এই বিশাল সেনাদলের সংকুলান হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার।[৬৭] অল্প বয়স্ক তরুণ দাঊদ ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য। পথিমধ্যে সেনাপতি তালূত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। সম্মুখেই ছিল এক নদী। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। পিপাসায় ছিল সবাই কাতর। এ বিষয়টি কুরআন বর্ণনা করেছে নিম্নরূপ:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللهِ: كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-(البقرة ٢٤٩)-

৬৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৮; আমরা মনে করি স্থান সংকুলান বড় কথা নয়। যুদ্ধটাই বড় কথা। কেননা আমরা দেখেছি যে, পরবর্তীতে এর পাশেই আজনাদাইন ও ইয়ারমূক যুদ্ধে ২,৪০,০০০ রোমক সৈন্যের মুকাবিলায় মুসলমানরা ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছে ও বিজয়ী হয়েছে (ঐ, ৭/৭)।*

Contents

‘অতঃপর তালূত যখন সৈন্যদল নিয়ে বের হ’ল, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদী হ’তে পান করবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বাদ গ্রহণ করবে না, সেই-ই আমার দলভুক্ত হবে। তবে হাতের এক আঁজলা মাত্র। অতঃপর সবাই সে পানি থেকে পান করল, সামান্য কয়েকজন ব্যতীত। পরে তালূত যখন নদী পার হ’ল এবং তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি (তখন অধিক পানি পানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ) লোকেরা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। (পক্ষান্তরে) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের একদিন উপস্থিত হ’তেই হবে, তারা বলল, কত ছোট ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বড় বড় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র হুকুমে। নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*।

বস্তুতঃ নদী পার হওয়া এই স্বল্প সংখ্যক ঈমানদারগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, যা শেষনবীর সাথে কাফেরদের বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধরত ছাহাবীগণের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। পানি পানকারী হাযারো সৈনিক নদী পারে আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ পানি পান করা থেকে বিরত থাকা স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার সাথী নিয়েই তালূত চললেন সেকালের সেরা সেনাপতি ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূতের বিরুদ্ধে। বস্তুবাদীগণের হিসাব মতে এটা ছিল নিতান্তই আত্মহননের শামিল। এই দলেই ছিলেন দাঊদ। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-(البقرة ٢٥٠)-

‘আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হ’ল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর ও আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’ *(বাক্বারাহ ২/২৫০)*।

জালূত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে

আহ্বান করতে থাকল। অল্পবয়স্ক বালক দাঊদ নিজেকে সেনাপতি তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত তাকে পাঠাতে রাযী হ'লেন না। কিন্তু দাঊদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালূত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহ্র নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালূতকে বধ করে ফিলিস্তীন পুনরুদ্ধার করতে পারবে, তাকে রাজ্য পরিচালনায় শরীক করা হবে। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জালূতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। কেননা তার সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। তাই তরবারি বা বল্লম দিয়ে তাকে মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দাঊদ ছিলেন পাথর ছোঁড়ায় উস্তাদ। সমবয়সীদের সাথে তিনি মাঠে গিয়ে নিশানা বরাবর পাথর মারায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দাঊদ পকেট থেকে পাথর খণ্ড বের করে হাতীর পিঠে বসা জালূতের চক্ষু বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই জালূতের চোখশুদ্ধ মাথা ফেটে মগয বেরিয়ে চলে গেল। এভাবে জালূত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালূত বিজয় লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-(البقرة ٢٥١)-

'অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাঊদকে দান করলেন রাজ্য ও দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন, যা তিনি চাইলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি এভাবে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্তই দয়াশীল' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হ'ল জ্ঞান ও দৈহিক স্বাস্থ্য, যা তালূতের মধ্যে ছিল।

(২) নেতৃত্বের জন্য বংশ ও অর্থ-সম্পদের চাইতে বড় প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীলতা।

(৩) নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ’ল কর্মীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা। যেমন তালূত করেছিলেন।

(৪) চিরকাল সংখ্যালঘু ঈমানদারগণ সংখ্যাগুরু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে থাকে। যা তালূত ও জালূতের ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

(৫) আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কুশলী সেনাপতি এবং স্বল্পসংখ্যক নিবেদিত প্রাণ লোকই যথেষ্ট হয় বিজয় লাভের জন্য। তালূত ও দাঊদ যার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

(৬) অস্ত্রবল ও জনবলের চাইতে ঈমানী বল যেকোন বিজয়ের মূল শক্তি।

(৭) উপরোক্ত ঘটনায় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তালূত কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁর আমলেই বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে দু’টি দলের সৃষ্টি হয়। একদল তালূতের অনুগত মুমিন। যারা নিজেদেরকে ‘বনূ ইস্রাঈল’ বলেই পরিচিত করে। অর্থ ‘আল্লাহ্র দাস’-এর বংশ। অপর দল ছিল মুনাফিক- যাদেরকে ‘ইয়াহুদী’ বলা হ’ত। প্রকৃত বনু ইস্রাঈলগণ ‘ইয়াহুদী’ নামকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজও পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত হয়েই আছে। অতদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না মুসলমানরা একে একে এদেরকে হত্যা করবেন। গাছ ও পাথর পর্যন্ত এদের পালিয়ে থাকা অবস্থান মুসলমানদের জানিয়ে দেবে।[৬৮]

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী :

তালূত ‘আমালেক্বা দখলদারদের হটিয়ে শামের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। অতঃপর দাঊদ কতদিন পরে নবী হন এবং তালূতের পরে কখন তিনি শাসনক্ষমতায় আসেন, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন বলে আমরা ধরে নিতে পারে। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তন্মধ্যে সুলায়মান (আঃ) নবুঅত ও শাসন ক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে *(নমল ২৭/১৬)* পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ পিতা ও পুত্রকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা কুরআন থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি সেটুকুই পেশ করব সত্যসন্ধানী পাঠকের

৬৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪১৪ ‘ফিতান’ অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ।

জন্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন কোন গল্পগ্রন্থ নয়। মানুষের হেদায়াতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র সেখানে পাওয়া যায়। বাকী তথ্যাবলীর উৎস হ'ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ, যার কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। বরং সেখানে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় দাঊদ ও সুলায়মানের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। আর সেইসব নোংরা কাহিনীকে ভিত্তি করে আরবী, উর্দূ, ফার্সী এমনকি বাংলা ভাষায়ও লিখিত হয়েছে 'নবীদের কাহিনী' নামে বহু বাজে বই-পুস্তিকা। নবীগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসী ঈমানদার পাঠকগণ ঐসব বইপত্র থেকে দূরে থাকবেন, এটাই আমরা একান্তভাবে কামনা করব। বরং আমাদের পরামর্শ থাকবে, ঐসব উদ্ভট ও নোংরা গল্পগুজবে ভরা তথাকথিত ধর্মীয় (?) বই-পত্র আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। তাতে নিজের ও পরিবারের এবং অন্যদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সেমতে দাঊদ (আঃ)-কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে বিবৃত হ'ল।-

১. আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান করে সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ-(ص ١٧)- 'স্মরণ কর, আমার বান্দা দাঊদকে। সে ছিল শক্তিশালী এবং আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। আয়াতের প্রথমাংশে তাঁর দৈহিক ও দুনিয়াবী শাসন শক্তির কথা বলা হয়েছে এবং শেষাংশে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। এজন্য যে, বিরাট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সকল কাজে তাঁর দিকেই ফিরে যেতেন।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ'ল দাঊদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পসন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না'।[৬৯]

৬৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫ 'রাত্রিতে নফল ছালাতে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।*

২. পাহাড় ও পক্ষীকুল তাঁর অনুগত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ- وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً، كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ-(ص ١٨-١٩)-

‘আমরা পর্বতমালাকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করত’। ‘আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হ’ত। সবাই ছিল তার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/১৮-১৯)*। একই মর্মে বক্তব্য এসেছে সূরা সাবা ১০ আয়াতে। অন্যদিকে আল্লাহ দাঊদ-পুত্র সুলায়মানের অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন বায়ুকে ও জিনকে। পাহাড় ও পক্ষীকুল হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কিভাবে আনুগত্য করত- সে বিষয়ে কোন বক্তব্য কুরআনে আসেনি। তাফসীরবিদগণ নানাবিধ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। আমরা সেগুলিকে এড়িয়ে গেলাম। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللهُ ‘আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও’।[৭০]

৩, ৪ ও ৫. তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ-(ص ٢٠)- ‘আমরা তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী বাগ্মিতা’ *(ছোয়াদ ৩৮/২০)*। উল্লেখ্য, আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) ও ইমাম শাবী বলেন যে, ‘তিনিই সর্বপ্রথম বক্তৃতায় হাম্‌দ ও ছালাতের পর أما بعد (‘অতঃপর’) শব্দ যুক্ত করেন’।[৭১] পূর্বেই আমরা বলেছি যে, তাঁর এই সাম্রাজ্য ছিল শাম ও ইরাক ব্যাপী। যা আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তীন ও ইরাককে শামিল করে। আল্লাহ বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ-(ص ٢٦)-

---

৭০. বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৪৩৮৮।
৭১. কুরতুবী বলেন, ‘যদি উক্ত বক্তব্য সঠিক হয়, তবে সেটি ছিল দাঊদ (আঃ)-এর নিজের ভাষায়, আরবী ভাষায় নয়’ (ঐ, তাফসীর ছোয়াদ ২০)।

‘হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তাহ’লে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হ’তে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ হ’তে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

৬. লোহাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ- أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ- (سبا ١٠-١١)-

‘...এবং আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম’ ‘এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর ও কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, তা আমরা দেখে থাকি’ *(সাবা ৩৪/১০-১১)*।

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। বিশেষ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন কুশলী কারিগর। যা বিক্রি করে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা নেওয়া কোন দোষের ছিল না। এখানে লোহাকে বাস্তবে মোমের মত নরম করার প্রকাশ্য অর্থ নিলে সেটা হবে তাঁর জন্য মু‘জেযা স্বরূপ, যা মোটেই অসম্ভব নয়। অবশ্য নরম করে দেওয়ার অর্থ লোহাকে সহজে ইচ্ছামত রূপ দেওয়ার ও উন্নতমানের নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদানও হ’তে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ-(الأنبياء ٨٠)-

‘আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? *(আম্বিয়া ২১/৮০)*।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বাদশাহ আওরঙ্গযেব (১৬৫৮-১৭০৭ খৃ:) নিজ হাতে টুপী সেলাই করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা

নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই নিতেন না। বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণই ছিলেন সকল উন্নত চরিত্রের পথিকৃৎ।

৭. আল্লাহ পাক দাঊদকে নবুঅত দান করেন এবং তাকে এলাহী কিতাব ‘যবূর’ দান করে কিতাবধারী রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। যেমন তিনি বলেন, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوْرًا- ‘আমরা দাঊদকে ‘যবূর’ প্রদান করেছিলাম’ *(নিসা ৪/১৬৩)*। হযরত দাঊদকে যে আল্লাহ অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করছিলেন, সেটা যেন যবূরের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তব রূপ। কেননা যবূরে আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পৃথিবীর অধিকারী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ- (الأنبياء ١٠٥)-

‘আমরা বিভিন্ন উপদেশের পর যবূরে একথা লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে’ *(আম্বিয়া ২১/১০৫)*।

৮. তাঁকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল। যখন তিনি যবূর তেলাওয়াত করতেন, তখন কেবল মানুষ নয়, পাহাড় ও পক্ষীকুল পর্যন্ত তা একমনে শুনত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ- (سبا ١٠)-

‘আমরা দাঊদের প্রতি আমাদের পক্ষ হ’তে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম এই মর্মে আদেশ দান করে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে বারবার তাসবীহ সমূহ আবৃত্তি কর এবং (একই নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা) পক্ষীকুলকেও ...’ *(সাবা ৩৪/১০)*। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাহাড় ও মাটির এক ধরনের জীবন রয়েছে, যা তাদের জন্য উপযোগী।[৭২] এ বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ-(الأنبياء ٧٩)-

৭২. *দ্রঃ হামীম সাজদাহ ৪১/১১; মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ই,ফা,বা, ২০০৩) পৃঃ ৩৫৭, ৩৮৬-৮৯।*

'আমরা পাহাড়কে ও পক্ষীকুলকে দাঊদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তাসবীহ পাঠ করত এবং আমরা এটা করে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৭৯)*।

অতএব দাঊদের কণ্ঠস্বর শোনা, তাঁর অনুগত হওয়া ও আল্লাহ্র বাণী যবূরের আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা পাহাড় ও পক্ষীকুলের জন্য মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য বনের পশু, পাহাড়, বৃক্ষ তাঁর সামনে মাথা নুইয়েছে ও ছায়া করেছে, এমনকি স্বস্থান থেকে উঠে এসে বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, এগুলি সব চাক্ষুষ ঘটনা।[৭৩] একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর তিন সাথী আবুবকর, ওমর ও ওছমান একটি পাহাড়ে উঠলেন। তখন পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়টিকে ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হও! তোমার উপরে আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ'।[৭৪] এর দ্বারা উদ্ভিদ ও পর্বতের জীবন ও অনুভূতি প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্র অপর নবী দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়, পক্ষী, লৌহ ইত্যাদি অনুগত হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদিও বস্তুবাদীরা চিরকাল সন্দেহের অন্ধকারে থেকেছে, আজও থাকবে। আল্লাহ্র রহমত না হ'লে ওরা অন্ধকারের ক্রিমিকীট হয়েই মরবে।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী :

(১) ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার: ইমাম বাগাভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা

৭৩. *তিরমিযী, শারহুস সুন্নাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৯১৮, ২২,২৪-২৬ 'মো'জেযা' অনুচ্ছেদ-৯।*
৭৪. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬০৬৬ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; হাদীছ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৯৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৬/৩৯-৪০ পৃ:। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আমৃত্যু ওছমান (রাঃ) ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার বিরোধীরা ছিল স্রেফ মিথ্যারোপকারী। এযুগেও তারা মিথ্যা রটনাকারী। অতএব সত্যসন্ধানীরা এদের অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকবেন। -লেখক।*

ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হ’ত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হ’ত’। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে’। হযরত দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً- (الأنبياء ٧٨-٧٩)-

‘আর স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

বস্তুতঃ উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা প্রসূত ছিল। কিন্তু অধিক উত্তম বিবেচনায় হযরত দাঊদ স্বীয় পুত্রের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আর সেকারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে ভূষিত করে বলেছেন যে, ‘আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি’। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান করতে পারেন।

(২) ইবাদত খানায় প্রবেশকারী বাদী-বিবাদীর বিচারঃ হযরত দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহ'লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হ'তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হ'তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ- إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ- فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (ص ٢١-٢٥)-

'আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা পাঁচিল টপকিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল'? *(ছোয়াদ ২১)* 'যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বিবদমান পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' *(২২)*। '(বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে আমার উপরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে' *(২৩)*। 'দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা

প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হ’ল’ *(২৪)*। অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল’ *(ছোয়াদ ৩৮/২১-২৫)*।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঊদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে সেই প্রাচীন যুগের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা নবী ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে এ যুগে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে যেটাই বলা হবে, তাতে ভ্রান্তির আশংকা থেকেই যাবে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী পণ্ডিতেরা তাদের স্বগোত্রীয় এই মর্যাদাবান নবীর উক্ত ঘটনাকে এমন নোংরাভাবে পেশ করেছে, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। বলা হয়েছে, দাঊদ (আঃ)-এর নাকি ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর এক সৈন্যের স্ত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ করেন। অতঃপর উক্ত সৈনিককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ দু’জন ফেরেশতাকে বাদী ও বিবাদীর বেশে পাঠিয়ে তাকে শিক্ষা দেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৩) শনিবার ওয়ালাদের পরিণতি: বনু ইস্রাঈলদের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকুলের বাসিন্দা ছিল এবং মৎস্য শিকার ছিল তাদের পেশা। ফলে দাঊদ (আঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে ‘মস্খ’ বা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْاْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ- (البقرة ٦٥-٦٦)-

‘আর তোমরা তো তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও’। ‘অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য

দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম' *(বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)*।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ বলেন যে, বৃদ্ধরা শূকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

উক্ত বিষয়ে সূরা আ'রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত। বাহ্যতঃ এরা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও সুবিধাবাদী। এরাও ফাসেকদের সাথে শূকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً، قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ- (الأعراف ١٦٤-١٦٥)-

'আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা ঐ লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তাদের আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? ঈমানদারগণ বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে ওরা সতর্ক হয়'। 'অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা

সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের কারণে’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৪-৬৫)*।

এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হবে। অতএব হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই।

ছহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! এ যুগের বানর-শূকরগুলো কি সেই আকৃতি পরিবর্তিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন, কিংবা তাদের উপরে আকৃতি পরিবর্তনের আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের বংশধারা থাকে না। আর বানর-শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।[৭৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা খায় না, পান করে না এবং তিন দিনের বেশী বাঁচে না।[৭৬]

তালূতের পরে বনু ইস্রাঈলগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। যালেম বাদশাহদের দ্বারা তারা শাম দেশ হ’তে বিতাড়িত হয়। বিশেষ করে পারস্যরাজ বুখতানছর যখন তাদেরকে শাম থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তাদের একদল হেজাযে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা দাঊদ ও সুলায়মানের নির্মিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছি। ফলে এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম-ইসমাঈলের নির্মিত কা‘বা গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাতে আমরা বা আমাদের বংশধররা শেষনবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়। সেমতে তারা আরবে হিজরত করে এবং ইয়াছরিবে বসবাস শুরু করে।

---

৭৫. *মুসলিম, ‘তাক্বদীর’ অধ্যায় হা/৬৭৭০।*
৭৬. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫, পৃ: ১/৪৭৯।*

সংশয় নিরসন

(১) দাঊদ (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত :

ছোয়াদ ২৪ : وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّـــاهُ ‘দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি’। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, أوقعناه في فتنة أى بلية بمحبته تلك المرأة ‘অর্থাৎ উক্ত মহিলার প্রতি আসক্তির মাধ্যমে আমরা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি’। ভিত্তিহীন এই তাফসীরের মাধ্যমে নবীগণের উচ্চ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষ করে দাঊদ (আঃ)-এর মত একজন মহান রাসূলের উপরে পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার অমার্জনীয় তোহমত আরোপ করা হয়েছে। অথচ এটি পরিষ্কারভাবে ইহুদী-নাছারাদের বানোয়াট গল্প ব্যতীত কিছুই নয়। যারা তাদের নবীদের বিরুদ্ধে চুরি, যেনা ও অনুরূপ অসংখ্য নোংরা তোহমত লাগিয়েছে ও হাযার হাযার নবীকে হত্যা করেছে *(বাক্বারাহ ৯১)*। তাদের রচিত তথাকথিত তওরাত-ইঞ্জীল সমূহ *(বাক্বারাহ ৭৯)* এ ধরনের কুৎসায় ভরপুর হয়ে আছে।

(২) একই সূরায় ২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বর্ননা করেছেন যে, দাঊদ (আঃ)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। অথচ তিনি অন্যজনের একমাত্র স্ত্রীকে তলব করেন এবং তাকে বিবাহ করেন ও তার সাথে সহবাস করেন’ (নাঊযুবিল্লাহ)। একাজটি যে অন্যায় ছিল, সেটা বুঝানোর জন্য দু’জন ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে বাদী-বিবাদী সেজে অতর্কিতভাবে তাঁর এবাদতখানায় প্রবেশ করে। অতঃপর বিবাদী তাকে বলে যে, সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি দুম্বার মালিক। এরপরেও সে বলে এটি আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় আমার উপরে কঠোরতা আরোপ করে’ *(ছোয়াদ ২৩)*। দাঊদ (আঃ) এটিকে অন্যায় হিসাবে বর্ণনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মাধ্যমে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, যা ২৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ঘটনাটিকে সাদা চোখে দেখলে একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয় হবে, যা সাধারণতঃ যেকোন বিচারকের নিকটে বা রাজদরবারে হয়ে থাকে। অথচ কাল্পনিকভাবে দু’জনকে ফেরেশতা সাজিয়ে ও দুম্বাকে স্ত্রী কল্পনা করে তাফসীরের নামে রসালো গল্প পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হ’তে পারে, তাহ’লে দাঊদ (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণ কি?

জবাব এই যে, দাঊদ (আঃ) আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। ঐ সময়টুকু তিনি কেবল ইবাদতেই রত থাকতেন। কিন্তু হঠাৎ পাঁচিল টপকিয়ে দু’জন অপরিচিত লোক ইবাদতখানায় প্রবেশ করায় তিনি ভড়কে যান। কিন্তু পরে তাদের বিষয়টি বুঝতে পারেন ও ফায়ছালা করে দেন। তাদের থেকে ভীত হওয়ার বিষয়টি যদিও কোন দোষের ব্যাপার ছিল না, তবুও এটাকে তিনি আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের খেলাফ মনে করে লজ্জিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তাঁর তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নিলেন। দ্বিতীয়তঃ অধিক ইবাদতের কারণে প্রজাস্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে মনে করে তিনি লজ্জিত হন এবং এজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও আমানতদার হওয়া। আরও প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নতমানের বাগ্মিতা। যার সব কয়টি গুণ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল।

২. এলাহী বিধান দ্বীন ও দুনিয়া দু’টিকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। বরং দ্বীনদার শাসকের হাতেই দুনিয়া শান্তিময় ও নিরাপদ থাকে। হযরত দাঊদ-এর শাসনকাল তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

৩. দ্বীনদার শাসককে আল্লাহ বারবার পরীক্ষা করেন। যাতে তার দ্বীনদারী অক্ষুণ্ন থাকে। দাঊদ (আঃ) সে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিকে সদা প্রত্যাবর্তনশীল।

৪. যে শাসক যত বেশী আল্লাহ্র শুকরগুযারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি তত বেশী সদয় হন এবং ঐ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন। বস্তুতঃ দাঊদ (আঃ) সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম পালন করতেন।

৫. যে শাসক আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হন, আল্লাহ দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তার প্রতি অনুগত করে দেন। যেমন দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়-পর্বত, পক্ষীকুল এবং লোহাকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল।

১৮. হযরত সুলায়মান *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাযার বছর পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুঅতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নে'মত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান করেননি। ইমাম বাগাভী ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তের বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন *(মাযহারী, কুরতুবী)*। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ৭টি সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৭] আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীরূপে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

বাল্যকালে সুলায়মান :

(১) আল্লাহ পাক সুলায়মানকে তার বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা হযরত দাঊদ (আঃ) যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান তার চাইতে উত্তম ফায়ছালা পেশ করেছিলেন। ফলে হযরত দাঊদ (আঃ) নিজের পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্রের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সে মোতাবেক রায় দান করেন।

উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً (الأنبياء ٧٨-٧٩)-

---

৭৭. *যথাক্রমে (১) সূরা বাক্বারাহ ২/১০২; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) আন'আম ৬/৮৪; (৪) আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) নমল ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) সাবা ৩৪/১২-১৪; (৭) ছোয়াদ ৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত।*

‘আর স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত সুলায়মানকে পরবর্তীতে যথার্থভাবেই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ‘সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন’ *(নমল ২৭/১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّـــهُ أَوَّابٌ (ص ٣٠)– ‘আমরা দাঊদের জন্য সুলায়মানকে দান করেছিলাম। কতই না সুন্দর বান্দা সে এবং সে ছিল (আমার প্রতি) সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩০)*।

(২) আরেকটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ: ‘দু’জন মহিলার দু’টি বাচ্চা ছিল। একদিন নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যায়। তখন প্রত্যেকে বলল যে, তোমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। যেটি আছে ওটি আমার বাচ্চা। বিষয়টি ফায়ছালার জন্য দুই মহিলা খলীফা দাঊদের কাছে এলো। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। তখন তারা বেরিয়ে সুলায়মানের কাছে এলো এবং সবকথা খুলে বলল। সুলায়মান তখন একটি ছুরি আনতে বললেন এবং বাচ্চাটাকে দু’টুকরা করে দু’মহিলাকে দিতে চাইলেন। তখন বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, *ইয়ারহামুকাল্লাহু* ‘আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন’ বাচ্চাটি ঐ মহিলার। তখন সুলায়মান কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন’।[৭৮]

সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

দাঊদ (আঃ)-এর ন্যায় সুলায়মান (আঃ)-কেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি। যেমন: (১) বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া (২) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা (৩) জিনকে অধীনস্ত করা (৪) পক্ষীকূলকে অনুগত করা (৫) পিপীলিকার ভাষা বুঝা (৬) অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা (৭) প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া। নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হ’ল:

৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৯ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯*।

১. বায়ু প্রবাহকে তাঁর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হুকুম মত বায়ু তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত স্থানে বহন করে নিয়ে যেত। তিনি সদলবলে বায়ুর পিঠে নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে দু'মাসের পথ একদিনে পৌঁছে যেতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ...-(سبا ٣٤)-

'এবং আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত...' *(সাবা ৩৪/১২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে যে কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ ও জিনের চার লক্ষ আসন বিশিষ্ট বিশাল বহর নিয়ে সুলায়মান বায়ু প্রবাহে যাত্রা করতেন এবং সারা পথ ছালাতে রত থাকতেন ও এই মহা নে'মত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন। এত দ্রুত চলা সত্ত্বেও বায়ু তরঙ্গে তাঁদের উপরে কোনরূপ চাপ সৃষ্টি হ'ত না এবং রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য মাথার উপর দিয়ে লাখ লাখ পাখি তাদেরকে ছায়া করে যেত' ইত্যাদি যেসব কথা তাফসীরের কেতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِيْنَ- (الأنبياء ٨١)-

'আর আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে। যা তার আদেশে প্রবাহিত হ'ত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি। আর আমরা সকল বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছি' *(আম্বিয়া ২১/৮১)*। অন্যত্র আল্লাহ উক্ত বায়ুকে رُخَاء বলেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৩৬)*। যার অর্থ মৃদু বায়ু, যা শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করে না। عَاصِفَةً ও رُخَاء দু'টি বিশেষণের সমন্বয় এভাবে হ'তে পারে যে, কোনরূপ তরঙ্গ সংঘাত সৃষ্টি না করে তীব্র বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়াটা ছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমত এবং সুলায়মানের অন্যতম মু'জেযা।

উল্লেখ্য যে, হাসান বাছরীর নামে যেকথা বলা হয়ে থাকে যে, একদিন ঘোড়া তদারকি করতে গিয়ে সুলায়মানের আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। সেই ক্ষোভে তিনি সব ঘোড়া যবেহ করে দেন। ফলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে

পুরস্কার স্বরূপ বায়ু প্রবাহকে অনুগত করে দেন বলে যেকথা তাফসীরের কেতাবসমূহে চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি হিংসুক ইহুদীদের রটনা মাত্র।[৭৯]

২. তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে আল্লাহ সুলায়মানের জন্য তরল ধাতুতে পরিণত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ... ‘আমরা তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম...’ *(সাবা ৩৪/১২)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি সহজে পাত্রাদি তৈরী করা যেত। সুলায়মানের পর থেকেই তামা গলিয়ে পাত্রাদি তৈরী করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাঊদের জন্য ছিল লোহা গলানোর মু‘জেযা এবং পুত্র সুলায়মানের জন্য ছিল তামা গলানোর মু‘জেযা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ‘হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ’ *(সাবা ৩৪/১৩)*।

দু’টি সূক্ষ্মতত্ত্ব :

(ক) দাঊদ (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থ লোহাকে নরম ও সুউচ্চ পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ শক্ত তামাকে গলানো এবং বায়ু, জিন ইত্যাদি এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকে অনুগত করে দিয়েছিলেন, যা চোখেও দেখা যায় না। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র শক্তি বড়-ছোট সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

(খ) এখানে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র তাক্বওয়াশীল অনুগত বান্দারা আল্লাহ্র হুকুমে বিশ্বচরাচরের সকল সৃষ্টির উপরে আধিপত্য করতে পারে এবং সবকিছুকে বশীভূত করে তা থেকে খিদমত নিতে পারে।

৩. জিনকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ...(سبا ١٢)- ‘আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক

৭৯. *কুরতুবী, সাবা ১২ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।*

তার (সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহ্‌র) আদেশে...' *(সাবা ৩৪/১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ-(الأنبياء ٨٢)-

'এবং আমরা তার অধীন করে দিয়েছিলাম শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া অন্য আরও কাজ করত। আমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম' *(আম্বিয়া ২১/৮২)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ- وَآخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ- (ص ٣٧-٣٨)-

'আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী'। 'এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৭-৩৮)*।

বস্তুতঃ জিনেরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত তুলে আনত এবং সুলায়মানের হুকুমে নির্মাণ কাজ সহ যেকোন কাজ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। ঈমানদার জিনেরা তো ছওয়াবের নিয়তে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করত। কিন্তু দুষ্ট জিনগুলো বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। এই অদৃশ্য শৃংখল কেমন ছিল, তা কল্পনা করার দরকার নেই। আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত থাকাটাও এক প্রকার শৃংখলবদ্ধ থাকা বৈ কি!

'শয়তান' হচ্ছে আগুন দ্বারা সৃষ্ট বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। জিনের মধ্যকার অবাধ্য ও কাফির জিনগুলিকেই মূলতঃ 'শয়তান' নামে অভিহিত করা হয়। আয়াতে 'শৃংখলবদ্ধ' কথাটি এদের জন্যেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে থাকায় এরা সুলায়মানের কোন ক্ষতি করতে পারত না। বরং সর্বদা তাঁর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আল্লাহ নিজেই কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ... (سبا ١٣)-

‘তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপরে স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত...’ *(সাবা ৩৪/১৩)*। উল্লেখ্য যে, تماثيل তথা ভাস্কর্য কিংবা চিত্র ও প্রতিকৃতি অংকন বা স্থাপন যদি গাছ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের হয়, তাহ’লে ইসলামে তা জায়েয রয়েছে। কিন্তু যদি তা প্রাণীদেহের হয়, তবে তা নিষিদ্ধ।

৪. পক্ষীকুলকে সুলায়মানের অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ – (نمل ١٦)-

‘সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বলেছিল, হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব’ *(নমল ২৭/১৬)*।

পক্ষীকুল তাঁর হুকুমে বিভিন্ন কাজ করত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্র তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ রাজ্যের রাণী বিলক্বীসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা পরে বিবৃত হবে।

৫. পিপীলিকার ভাষাও তিনি বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا...- (نمل ١٨-١٩)-

‘অবশেষে সুলায়মান তার সৈন্যদল নিয়ে পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল। তখন পিপীলিকা (নেতা) বলল, হে পিপীলিকা দল! তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের

পিষ্ট করে ফেলবে'। 'তার এই কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল... *(নমল ২৭/১৮-১৯)*।

৬. তাঁকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করা হয়নি। এজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكاً لاَّ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- (ص ٣٥)-

'সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, পয়গম্বরগণের কোন দো'আ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। সে হিসাবে হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দো'আটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। কেবল ক্ষমতা লাভ এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর পিছনে আল্লাহ্র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কেননা আল্লাহ জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সুলায়মান তাওহীদ ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করবেন এবং তিনি কখনোই অহংকারের বশীভূত হবেন না। তাই তাঁকে এরূপ দো'আর অনুমতি দেওয়া হয় এবং সে দো'আ সর্বাংশে কবুল হয়।

ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লামা জুবাঈ বলেন, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তিনি এটা চেয়েছিলেন। কেননা নবীগণ আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন সুফারিশ করতে পারেন না। তাছাড়া এটা বলাও সঙ্গত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বর্তমানে (জাদু দ্বারা বিপর্যস্ত এই দেশে) তুমি ব্যতীত দ্বীনের জন্য কল্যাণকর এবং যথার্থ শাসনের যোগ্যতা অন্য কারু মধ্যে নেই। অতএব তুমি প্রার্থনা করলে আমি তোমাকে তা দান করব।' সেমতে তিনি দো'আ করেন ও আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন।[৮০]

---

৮০. *মাহমূদ আলূসী (মৃ: ১২৭০হি:), রূহুল মা'আনী (বৈরুত: দার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), তাফসীর সূরা ছোয়াদ ৩৫, ২৩/২০১ পৃ:*।

৭. প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব রাখা বা না রাখার অনুমতি প্রদান। আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব লাভের দো‘আ কবুল করার পরে তার প্রতি বায়ু, জিন, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তু সমূহকে অনুগত করে দেন। অতঃপর বলেন,

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ- (ص ٣٩-٤٠)-

‘এসবই আমার অনুগ্রহ। অতএব এগুলো তুমি কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও, তার কোন হিসাব দিতে হবে না’। ‘নিশ্চয়ই তার (সুলায়মানের) জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩৯-৪০)*।

বস্তুতঃ এটি ছিল সুলায়মানের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে প্রদত্ত একপ্রকার সনদপত্র। পৃথিবীর কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন সত্যায়নপত্র নাযিল হয়েছে বলে জানা যায় না। অথচ এই মহান নবী সম্পর্কে ইহুদী-নাছারা বিদ্বানরা বাজে কথা রটনা করে থাকে।

সুলায়মানের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :

(১) ন্যায় বিচারের ঘটনা : ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় তাঁর দেওয়া প্রস্তাব বাদশাহ দাঊদ (আঃ) গ্রহণ করেন ও নিজের দেওয়া পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন। এটি ছিল সুলায়মানের বাল্যকালের ঘটনা, যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন *(দ্রঃ আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*। এ ঘটনা আমরা দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীতে বলে এসেছি।

(২) পিপীলিকার ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ- وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ- حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ- (نمل ١٦-١٩)-

'সুলায়মান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হ'ল এবং বলল, হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব' *(নমল ১৬)*। 'অতঃপর সুলায়মানের সম্মুখে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হ'ল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হ'ল' *(১৭)*। 'অতঃপর যখন তারা একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় উপনীত হ'ল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে' *(১৮)*। 'তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৬-১৯)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ) কেবল পাখির ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার কথাও বুঝতেন। এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবল জিন-ইনসানের নয় বরং তাঁর সময়কার সকল জীবজন্তুরও নবী

ছিলেন। তাঁর নবুঅতকে সবাই স্বীকার করত এবং সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করত। যদিও জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য প্রাণী শরী‘আত পালনের হকদার নয়।

(৩) ‘হুদহুদ’ পাখির ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, ‘হুদহুদ’ পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করলেন। সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। উক্ত ঘটনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِينٍ- (نمل ٢٠-٢٢)-

‘সুলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, কি হ’ল হুদহুদকে দেখছি না যে? না-কি সে অনুপস্থিত’ *(নমল ২০)*। সে বলল, ‘আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবহ করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ’ *(২১)*। ‘কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকটে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি’ *(নমল ২৭/২০-২২)*।

এ পর্যন্ত বলেই সে তার নতুন আনীত সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। হুদহুদের মাধ্যমে একথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, নবীগণ গায়েবের খবর রাখেন না। তাঁরা কেবল অতটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য যে, ‘হুদহুদ’ এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা নও মুসলিম ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে বিশেষভাবে ‘হুদহুদ’ পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি

বলেন, সুলায়মান (আঃ) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়'। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'হুদহুদ' পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে' ইবনুল আযরক্ব তাঁকে বলেন,

قِفْ يا وَقَّافُ ! كيف يَرَى الهدهدُ باطنَ الأرضِ وهو لا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فيه–

'জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু (তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়'। জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إذا جاء القَــدَرُ عَمِــيَ البَــصَرُ 'যখন তাক্বদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়'। চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল 'আরাবী বলেন, لايَقْدِرُ على هذا الجوابِ إلا عــالِمُ القــرانِ 'এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের আলেম ব্যতীত'।[৮১]

(৪) রাণী বিলক্বীসের ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর ১৮তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 'সাবা'।[৮২] সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'সাবা' সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়। আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং 'সূর্য পূজারী'

---

৮১. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ২০ আয়াত।*
৮২. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত।*

হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ’তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই ‘সাবা’ সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বাড়ীর অনতিদূরে তাঁর সন্তান ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা জানতে পারেননি। স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি। বস্ততঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই। পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ সাম্রাজ্য সম্পর্কে পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলক্বীস মুসলমান হয়ে যান। বস্তুতঃ হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ- (نمل ٢٣-٢٤)-

‘আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে’ *(২৩)*। ‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না’ *(নমল ২৭/২৩-২৪)*।

সুলায়মান বলল,

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ (٢٧) اذْهَبْ بِكِتَابِيْ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ

إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِي فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوْ قُوَّةٍ وَأُوْلُوْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (٣٦) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيْمٌ (٤٠) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُوْنَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ (٤٣) قِيْلَ لَهَا ادْخُلِيْ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- (نمل ٢٧-٤٤)-

‘এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন’ (২৭)। ‘তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়’

(২৮)। ‘বিলক্বীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে’ *(২৯)*। ‘সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ’তে এবং তা হ’ল এই: করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)’ *(৩০)*। ‘আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও’ *(৩১)*। ‘বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না’ *(৩২)*। ‘তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন’ *(৩৩)*।

‘রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও এরূপ করবে’ *(৩৪)*। ‘অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে’ *(৩৫)*। ‘অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক’ *(৩৬)*। ‘ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত’ *(৩৭)*। ‘অতঃপর সুলায়মান বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আছ বিলক্বীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?’ *(৩৮)* ‘জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত’ *(৩৯)*। ‘(কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়’ *(নমল ৪০)*।

‘সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না?’ *(৪১)* ‘অতঃপর যখন বিলক্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ’ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি’ *(৪২)*। ‘বস্তুতঃ আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল’ *(৪৩)*। ‘তাকে বলা হ’ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্বীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ *(নমল ২৭/২৭-৪৪)*।

সূরা নমল ২২ হ’তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী বিলক্বীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে ‘যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল’ বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ’ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আঃ)। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। ‘আর এটি হ’ল আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ’ *(নমল ৪০)*। দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু‘জেযা এবং রাণী বিলক্বীসকে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিলক্বীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের ক্ষমতা ও প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান। মূলতঃ এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলক্বীসের জন্য তিনটি নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলক্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, বিলক্বীসের বক্তব্য وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ *(নমল ৪৪)*-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই *(তাফসীর বাগাভী)*।

(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা :

পিতা দাঊদের ন্যায় পুত্র সুলায়মানকেও আল্লাহ বারবার পরীক্ষায় ফেলেছেন তাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য। ফলে তাঁর জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতগণ সেই সব ঘটনার উপরে রং চড়িয়ে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভট সব গল্পের অবতারণা করে তাদেরই স্বগোত্র বনু ইস্রাঈলের এইসব মহান নবীগণের চরিত্র হনন করেছে। মুসলিম উম্মাহ বিগত সকল নবীকে সমানভাবে সম্মান করে। তাই ইহুদী-নাছারাদের অপপ্রচার থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনার উপরে নির্ভর করে। সেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, তার উপরেই তারা বাক সংযত রাখে।

আলোচ্য অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ- فَقَالَ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ- رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ-

(ص ٣١-٣٣)-

'যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ'ল' *(ছোয়াদ ৩১)*। 'তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণের জন্যই ঘোড়াগুলিকে মহব্বত করে থাকি (কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ঘোড়াগুলিকে দৌড়িয়ে দিল,) এমনকি সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল' *(৩২)*। '(অতঃপর সে বলল,) ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের গলায় ও পায়ে (আদর করে) হাত বুলাতে লাগল' *(ছোয়াদ ৩৮/৩১-৩৩)*।

উপরোক্ত তরজমাটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে ইবনু জারীরের গৃহীত ব্যাখ্যার অনুকূলে করা হয়েছে।

অনেকে উপরোক্ত তাফসীরের সাথে বিভিন্ন কথা যোগ করেছেন। যেমন ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন হওয়ার কারণে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সব ঘোড়া কুরবানী করে দেন। কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র নিকটে সূর্যকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন করেন। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি আছরের ছালাত আদায় করে নেন। তারপর সূর্য অস্তমিত হয়। বস্তুতঃ এইসব কথার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন দলীল নেই। অতএব এসব থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা :

আল্লাহ বলেন- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (ص ٣٤) 'আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হ'ল' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৪)*। এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই। এক্ষণে সেই নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল, একে সিংহাসনের উপর রাখার হেতু কি ছিল, এর মাধ্যমে কি ধরনের পরীক্ষা হ'ল- এসব বিবরণ কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কিছুই বর্ণিত হয়নি। অতএব এ বিষয়ে কেবল এতটুকু ঈমান রাখা কর্তব্য যে, সুলায়মান (আঃ) এভাবে পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি আল্লাহ্র প্রতি আরো বেশী রুজু হন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অটুট আনুগত্যের পরিচয় বহন করে।

উক্ত ঘটনাকে রং চড়িয়ে ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলায়মানের রাজত্বের গুঢ় রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান তাঁর আংটিটা হাতিয়ে নেয় এবং নিজেই সুলায়মান সেজে সিংহাসনে বসে। এদিকে আংটি হারা সুলায়মান (আঃ) সিংহাসন হারিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন। একদিন ঘটনাক্রমে একটি মাছের পেট থেকে সুলায়মান উক্ত আংটি উদ্ধার করেন ও চল্লিশ দিন পর পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন’। সিংহাসনে বসা ঐ শয়তানের রাখা কোন বস্তুকে এখানে আল্লাহ নিষ্প্রাণ দেহ বলেছেন।

বস্তুতঃ এসবই বানোয়াট কাহিনী। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে নবী বলেই স্বীকার করে না। বাহ্যতঃ এসব কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি’।

(৭) ‘ইনশাআল্লাহ’ না বলার ফল :

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি (আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহ্র পথে ঘোড় সওয়ার হয়ে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি ‘ইনশাআল্লাহ’ (অর্থঃ ‘যদি আল্লাহ চান’) বলতে ভুলে গেলেন। নবীর এ ত্রুটি আল্লাহ পসন্দ করলেন না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ট হ’ল’।[৮৩] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুলায়মান বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হ’লেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুম বরদার হ’লেও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অতএব তাঁর ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে যাওয়াটা ছোটখাট কোন অপরাধ নয়। এ ঘটনায় এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা যত বড় পদাধিকারী হবেন, তাদের ততবেশী আল্লাহ্র অনুগত হ’তে হবে এবং সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সর্বদা বিনীত হয়ে চলতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই অহংকার করা চলবে না।

---

৮৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২০ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯।*

অনেক তাফসীরবিদ সূরা ছোয়াদ ৩৪ আয়াতে বর্ণিত 'সিংহাসনের উপরে নিষ্প্রাণ দেহ' রাখার ঘটনার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য দেখে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন যে, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর উক্ত মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর 'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হ'লেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ক্বাযী আবুস সাঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম রাযীও আরেকটি তাফসীর করেছেন যে, সুলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে এমন দুর্বল হয়ে পড়েন যে, সিংহাসনে বসালে তাঁকে নিষ্প্রাণ দেহ বলে মনে হ'ত। পরে সুস্থ হ'লে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হন...। এ তাফসীর একেবারেই অনুমান ভিত্তিক। কুরআনী বর্ণনার সাথে এর কোন মিল নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের অকাট্ট তাফসীর বলা যায় না। কেননা এ ঘটনায় বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহের কোনটাতেই এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচ্য ঘটনাটিকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই অত্র হাদীছটি ছহীহ বুখারীর 'জিহাদ' 'আম্বিয়া' 'শপথসমূহ' প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক সনদে আনা হ'লেও সূরা ছোয়াদের উপরোক্ত ৩৪ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী আনেননি। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও আলোচ্য হাদীছটি উক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এটাও তেমনি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এটা কোন আয়াতের তাফসীর নয়।

বস্তুতঃ কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে একথা বুঝানো যে, তারা কোন বিপদাপদে বা পরীক্ষায় পতিত হ'লে যেন পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। যেমন সুলায়মান (আঃ) হয়েছিলেন।

(৮) হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের কাহিনী :

সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোঁকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন। তিনি কোন নবী নন। শয়তানদের ভেল্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এমনকি শেষনবী

(ছাঃ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন, তখন ইহুদী নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র। কেননা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষ কি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে? *(ইবনু জারীর)*।

এক্ষণে সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু‘জেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামে দু’জন ফেরেশতাকে ‘বাবেল’ শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। ‘বাবেল’ হ’ল ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐসময় জাদু বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুঅতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন।

জাদু ও মু‘জেযার পার্থক্য এই যে, জাদু প্রাকৃতিক কারণের অধীন। কারণ ব্যতীত জাদু সংঘটিত হয় না। কিন্তু দর্শক সে কারণ সম্পর্কে অবহিত থাকে না বলেই তাতে বিভ্রান্ত হয়। এমনকি কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং ঐ জাদুকরকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে ধারণা করতে থাকে। আজকের যুগে ভিডিও চিত্রসহ হাযার মাইল দূরের ভাষণ ঘরে বসে শুনে এবং দেখে যেকোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়া স্বাভাবিক। তেমনি সেযুগেও জাদুকরদের বিভিন্ন অলৌকিক বস্তু দেখে অজ্ঞ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ত।

পক্ষান্তরে মু‘জেযা কোন প্রাকৃতিক কারণের অধীন নয়। বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পাদিত হয়। নবী ব্যতীত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর ‘কারামত’ বা সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিও একইভাবে সম্পাদিত হয়। এতে প্রাকৃতিক কারণের যেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তির নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত নেই। উভয় বস্তুর পার্থক্য বুঝার সহজ উপায় এই যে, মু‘জেযা কেবল নবীগণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। যারা আল্লাহভীতি, উন্নত চরিত্র মাধুর্য এবং পবিত্র জীবন যাপন সহ সকল মানবিক গুণে সর্বকালে সকলের আদর্শ স্থানীয় হন।

আর নবী ও অলীগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবীগণ প্রকাশ্যে নবুঅতের দাবী করে থাকেন। কিন্তু অলীগণ কখনোই নিজেকে অলী বলে দাবী করেন না। অলীগণ সাধারণভাবে নেককার মানুষ। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে নির্বাচিত বান্দা, যাদেরকে তিনি নবুঅতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। নবীগণের মু‘জেযা প্রকাশে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নেই। পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকেরাই জাদুবিদ্যা শিখে ও তার মাধ্যমে নিজেদের দুনিয়া হাছিল করে থাকে। উভয়ের চরিত্র জনগণের মাঝে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ সুলায়মান (আঃ)-এর নবুঅতের সমর্থনেই আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে বাবেল শহরে পাঠিয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا واتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- (البقرة ١٠٢-١٠٣)-

‘(ইহুদী-নাছারাগণ) ঐ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। অথচ সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। বস্তুতঃ তারা (হারূত-মারূত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তুমি (জাদু শিখে) কাফির হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা কারু ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত ঐসব বস্তু যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো’। ‘যদি তারা ঈমান আনত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত’ *(বাক্বারাহ ২/১০২-১০৩)*।

বলা বাহুল্য, সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও জীবজন্তুর উপরে একচ্ছত্র ক্ষমতা দান করা ছিল আল্লাহ্র এক মহা পরীক্ষা। শয়তান ও তাদের অনুসারী দুষ্ট লোকেরা সর্বদা এটাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং যুক্তিবাদের ধূম্রজালে পড়ে পথ হারিয়েছে। অথচ আল্লাহ্র নবী সুলায়মান (আঃ) সর্বদা আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। আমরাও তার নবুঅতের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি।

(৯) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা :

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা‘বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকূব (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। তার প্রায় হাযার বছর পরে দাঊদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হ’লেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হ’ল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা

পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন নিম্নোক্ত ভাবে-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

(سبا ١٤)-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহ'লে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*। সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনে কাছীর)*।

সুলায়মানের এই অলৌকিক মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ'লে নবী-রাসূল যে-ই হৌন না কেন, এক সেকেণ্ডও আগপিছ হবে না।

(২) আল্লাহ কোন মহান কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে যেকোন উপায়ে তা সম্পন্ন করেন। এমনকি মৃত লাশের মাধ্যমেও করতে পারেন।

(৩) ইতিপূর্বে জিনেরা বিভিন্ন আগাম খবর এনে বলত যে, আমরা গায়েবের খবর জানি। অথচ চোখের সামনে মৃত্যুবরণকারী সুলায়মান (আঃ)-এর খবর তারা জানতে পারেনি এক বছরের মধ্যে। এতে তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী অসার প্রমাণিত হয়।

সংশয় নিরসন

(১) সুলায়মানের আংটি চুরি ও রাজত্ব হরণ :

বাক্বারাহ ১০২ : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ‘এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা (ইহুদীরা) তার অনুসরণ করত’।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে, من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لَمَّا نُزِعَ ملكُه- ‘(শয়তানেরা) জাদু হ’তে (আবৃত্তি করত), যা সুলায়মান-এর সিংহাসনের নীচে তারা দাফন করেছিল তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার প্রাক্কালে। আমরা বলি, সুলায়মান (আঃ) একজন জলীলুল ক্বদর নবী ছিলেন। তিনি জাদুকর ছিলেন না বা জাদুর শক্তির বলে তিনি সবকিছুকে অনুগত করেননি। তাঁর সিংহাসনের নীচে কোন জাদুও কেউ লুকিয়ে রাখেনি। তাছাড়া তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার মত কোন অঘটন ঘটেনি এবং এমন কোন খবরও আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দেননি। এগুলি নবীগণের মর্যাদার বরখেলাফ এবং স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র।

অতএব উক্ত আয়াত সমূহের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর অতুলনীয় সাম্রাজ্যে ঈর্ষান্বিত শয়তানেরা সর্বত্র রটিয়ে দেয় যে, জিন-ইনসান ও পশু-পক্ষী সবার উপরে সুলায়মানের একাধিপত্যের মূল কারণ হ’ল তাঁর পঠিত কিছু কালেমা, যার কিছু কিছু আমরা জানি। যারা এগুলি শিখবে ও তার উপরে আমল করবে, তারাও অনুরূপ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তখন লোকেরা ঐসব জাদু বিদ্যা শিখতে ঝুঁকে পড়ল ও তাদের অনুসারী হ’ল এবং কুফরী করতে শুরু করল। বর্ণিত আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সুলায়মান জাদুর বলে নয়, বরং আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা বলে দেশ শাসন করেন। মূল কথা হ’ল, ইহুদীরা সকল নবীকে গালি দিয়েছে এবং সেভাবে সুলায়মান (আঃ)-কেও তোহমত দিয়েছে।

(২) হারূত ও মারূতের কাহিনী :

একই আয়াতে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন, قال إبن عباس : هما ساحران، كانا

–يعلمان السحر ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা ছিলেন দু'জন জাদুকর। তারা জাদু শিক্ষা দিতেন'। অথচ তাঁরা জাদুকর ছিলেন না। বরং ফেরেশতা ছিলেন। যারা কখনোই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিলেন না। জাদুকর বলে তাদের উপরে তোহমত লাগানো হয়েছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত বাহরুল মুহীত্ব, বায়যাবী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে যে, (ক) আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। (খ) তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়। যারা যেখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। (গ) আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি আসমানে 'যোহরা' তারকা হিসেবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে'-- এগুলি সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প মাত্র, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ছাড়া কিছুই নয়।

মূল ঘটনা এই যে, ঐ সময় ইরাকের বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় শীর্ষে ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু বিদ্যার ফল বলে রটনা করত। তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে শিক্ষক হিসাবে মানুষের বেশে পাঠান। তারা লোকদের জাদু বিদ্যার অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত। যা কুরআনের উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) সুলায়মানের (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত :

ছোয়াদ ৩৪ : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ 'আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে বিনত হ'ল।' এখানে তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে,

ابتليناه بسبب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها، وكانت تعبد الصنم فى داره من غير علمه وكان مُلكه فى خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء عند أمرأة المسماة بالأمينة على عادته، فجاءها جنّى فى صورة سليمان فأخذه

منها... ثم أناب : رجع سليمان إلى مُلكه بعد أيام، بأن وصـــل إلى الخـــاتم فلبسه وجلس على كرسيه–

‘আমরা তাকে তার রাজত্বের কারণে পরীক্ষা করলাম। সেটা এই যে, তিনি একজন মহিলাকে বিবাহ করেন, যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। ঐ মহিলা তার গৃহে তার অগোচরে মূর্তি পূজা করত। আর সুলায়মানের রাজত্ব ছিল তার আংটির কারণে। একদিন তিনি টয়লেটে যাবার সময় অভ্যাসবশতঃ আংটিটি খুলে তাঁর উক্ত স্ত্রী ‘আমীনা’-র নিকটে রেখে যান। এমন সময় একটি জিন সুলায়মানের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয় ও তার নিকট থেকে আংটিটি নিয়ে নেয়।...অতঃপর সুলায়মান বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর সিংহাসনে অন্যজন বসে আছে এবং লোকেরা সবাই তাকে অস্বীকার করে।...‘অতঃপর সে বিনত হ’ল’ অর্থাৎ সুলায়মান কিছু দিন পরে তাঁর আংটির নিকটে পৌঁছে যান। অতঃপর আংটি পরিধান করে নিজ রাজ আসনে উপবেশন করেন’।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। কেননা এই ব্যাখ্যা দ্বারা নবী ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। যেখানে নবীদের ইয্যতের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্র, সেখানে এ ধরনের তাফসীর বাতিল প্রতিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে পরীক্ষার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে এই ঘটনা আমাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্য হ’ল যাতে আমরাও কোন পরীক্ষায় নিপতিত হ’লে দিশেহারা না হয়ে যেন আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু ও বিনীত হই- একথা বুঝানো। এখানে মূল ঘটনা বর্ণনা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়। তার কোন প্রয়োজনও নেই এবং তার জানার যথার্থ কোন উপায়ও আমাদের কাছে নেই।

এ সম্পর্কে মাননীয় তাফসীরকার যে আংটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাছাড়াও তাঁর আংটি শয়তানের করায়ত্ত হওয়া, ৪০দিন পরে তা মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সিংহাসন ফিরে পাওয়া ইত্যাদি গল্পকে হাফেয ইবনু কাছীর স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নবী সুলায়মানের স্বীয় স্ত্রীদের সাথে ঘটনার যে বিবরণ ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, সেটিকে ক্বাযী আবুস সঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ মুফাসসিরগণের ন্যায় অনেকে অত্র আয়াতের

তাফসীর ভেবেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। ইমাম বুখারী স্বয়ং উক্ত হাদীছকে অত্র আয়াতের তাফসীরে আনেননি। বরং বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুলায়মান নবী সম্বন্ধেও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মাত্র। অত্র আয়াতের শানে নুযূল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নয়। উল্লেখ্য যে, ই.ফা.বা. ঢাকা-র অনুবাদের টীকাতেও উক্ত ঘটনাকে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আনা হয়েছে (পৃঃ ৭৪৪ টীকা ১৪১)। যা নিতান্তই ভুল।

সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. নবুঅত ও খেলাফত একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

২. ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৩. প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন।

৪. শত্রুমুক্ত কোন মানুষ দুনিয়াতে নেই। সুলায়মানের মত একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ্র বিরুদ্ধেও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।

৫. সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে প্রজাসাধারণের কাজ করলেও তারা অনেক সময় না বুঝে বিরোধিতা করে। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আল্লাহ বাকী সময়ের জন্য সুলায়মানের প্রাণহীন দেহকে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন জিন মিস্ত্রী ও জোগাড়েদের ভয় দেখানোর জন্য। যাতে তারা কাজ ফেলে রেখে চলে না যায় এবং নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হবার সুযোগ না পায়।

সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল :

সুলায়মান (আঃ) ৫৩ বছর বেঁচেছিলেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাহবা'আম (رحبعام) ১৭ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে যায়।[৮৪] সুলায়মান মনছূরপুরীর হিসাব মতে শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর পূর্বে সুলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৮৫]

৮৪. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৯-৩০।*
৮৫. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১০৯ পৃঃ।*

১৯. হযরত ইলিয়াস *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে মাত্র দু’জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়। সূরা আন‘আম ৮৫ আয়াতে ও সূরা ছাফফাত **১২৩-১৩২** আয়াতে। সূরা আন‘আমে ৮৩-৮৫ আয়াতে **১৮** জন নবীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। সেখানে কোন আলোচনা স্থান পায়নি। তবে সূরা ছাফফাতে সংক্ষেপে হ’লেও তাঁর দাওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনায় এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, তিনি হযরত হিয্‌ক্বীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর পূর্বে দামেষ্কের পশ্চিমে বা‘লা বাক্কা (بعلبك) অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সময় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগকে ‘ইয়াহূদিয়াহ’ বলা হ’ত এবং তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসে। অপর ভাগের নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’ এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে।

ইলিয়াসের জন্মস্থান :

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল‘আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন।

ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা :

এই সময় ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও নাবলুস অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলদের দুই গ্রুপের দু’টি রাজধানী ছিল। তারা আপোষে পরস্পরে মারমুখী ছিল। ফেলে আসা নবুঅতী সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা অনেক দূরে একটি পতিত সমাজে পরিণত হয়েছিল। কিতাবধারী ও কিতাবহীন জাহেলী সমাজের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় ছিল না।

তখনকার ‘ইস্রাঈল’-এর শাসনকর্তার নাম ছিল ‘আখিয়াব’ বা ‘আখীব’। তার স্ত্রী ছিল ‘ইযবীল’। যে বা‘ল (بعـــل) নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে বা‘ল মূর্তির নামে এক বিশাল উপাসনালয় তৈরী করে এবং সেখানে সকল

বনু ইস্রাঈলকে মূর্তিপূজায় আহ্বান করে। দলে দলে লোক সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। মূসা-হারূণ, দাঊদ ও সুলায়মান নবীর উম্মতেরা বিনা দ্বিধায় শিরকের মহাপাতকে আত্মাহুতি দিচ্ছিল। এমন এক মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের নিকটে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য ইলিয়াসকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।

ইলিয়াসের দাওয়াত :

শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। ইলিয়াস ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ- أَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ- اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ- فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ- إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ- (الصافات ١٢٣-١٣٢)-

‘নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম’ *(ছাফফাত ১২৩)*। ‘যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না’? *(১২৪)* ‘তোমরা কি বা‘ল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে’? *(১২৫)* ‘যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা’ *(১২৬)*। ‘অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে’ *(১২৭)*। ‘কিন্তু আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত’ *(১২৮)*। আমরা এই নিয়মের উপরে পরবর্তীদেরকেও রেখে দিয়েছি’ *(১২৯)*। ‘ইলিয়াস-এর উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক’ *(১৩০)*। ‘এভাবেই আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ *(১৩১)*। ‘নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ছাফফাত ৩৭/১২৩-১৩২)*।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

বিগত নবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস (আঃ)-এর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ইস্রাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা‘ল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানালেন। কিন্তু দু’একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হ’ল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আঃ) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রাণী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আঃ) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তিনি যদি তাদেরকে মো‘জেযা প্রদর্শন করেন, তাহ’লে হয়ত তারা শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরে আসবে।

বাদশাহ্র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি :

আল্লাহ্র হুকুমে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি ইস্রাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হ’লেন। তিনি বললেন, দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হ’ল আল্লাহ্র নাফরমানী। তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত হ’লে এ আযাব দূর হ’তে পারে। তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের বা‘ল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ’ নবী (!) আছে। তাই যদি হয়, তাহ’লে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা‘ল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আঃ)-এর এ প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল।

আল্লাহ ও বা‘ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা :

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘কোহে কারমাল’ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে সমবেত হ’ল। বা‘ল দেবতার নামে তার মিথ্যা নবীরা কুরবানী পেশ করল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'ল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হ'ল। কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হ'ল না।

অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র নামে কুরবানী করলেন এবং যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। এভাবেই কবুল হয়েছিল আদমপুত্র হাবীলের কুরবানী। তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যেও এ রীতি গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইলিয়াসের বর্তমান ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আঃ)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বা'ল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা তাদের যিদের উপরে অটল রইল। এইসব মিথ্যা নবীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না।

ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র :

ওদিকে আখিয়াবের স্ত্রী ইখবীল হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার চক্রান্ত শুরু করে দিল। ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদিয়াহতে উপস্থিত হ'লেন। ঐসময় বা'ল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) সেখানে পৌঁছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। সেখানকার সম্রাট 'ইহুরাম'-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নিরাশ হ'লেন। অবশেষে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় 'ইস্রাঈলে' ফিরে এলেন এবং 'আখিয়াব' ও তার পুত্র 'আখযিয়া'-কে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল। অবশেষে তাদের উপরে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির গযব নাযিল হ'ল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি?

সুয়ূত্বী, ইবনে আসাকির, হাকেম প্রমুখের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, চারজন নবী জীবিত আছেন। তন্মধ্যে খিযির ও ইলিয়াস দুনিয়াতে এবং

ইদরীস ও ঈসা আসমানে রয়েছেন। কিন্তু হাকেম ও ইবনু কাছীর এসব বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেননি। সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এসব বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। ইলিয়াস (আঃ) স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করব।

বা‘ল দেবতার পরিচয় :

সূরা ছাফফাত ১২৫ আয়াতে যে বা‘ল (بعــل) দেবতার কথা বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি হিব্রু শব্দ। কেননা তখনকার সময় ফিলিস্তীন অঞ্চলের ভাষা ইবরানী বা হিব্রু ছিল। এটি ইস্রাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে শাম অঞ্চলে এর পূজা হ’ত এবং এটাই ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। বা‘ল বাক্কা (بعلبك) শব্দটি مركب بنــائى বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দের উদাহরণ হিসাবে আরবী ব্যাকরণের একটি অতি পরিচিত শব্দ। এটি লেবাননের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যা উক্ত বা‘ল দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারু কারু মতে জাহেলী আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি ‘হোবল’ (هبــل) এই বা‘লেরই অপর নাম। মক্কার খুযা‘আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই সর্বপ্রথম সিরিয়া থেকে বহু মূল্যের বিনিময়ে এই মূর্তি নিয়ে এসে কা‘বা গৃহে স্থাপন করেন এবং জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, সিরিয়রা এই মূর্তির অসীলায় পানি প্রার্থনা করে। আমরাও এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করব। তাতে সিরিয়ার ন্যায় মক্কা অঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এলাকা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। এটাই ছিল কা‘বা গৃহে স্থাপিত প্রথম দেবমূর্তি। পরে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে আরও মূর্তি এনে স্থাপন করে। এভাবে রাসূলের আবির্ভাবকালে তার সংখ্যা ৩৬০-য়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে তারা এর দ্বারা তাদের দাবী মতে ইবরাহীমী ধর্মের তাওহীদ বিশ্বাসে কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করত না। তারা এটাকে শিরক ভাবত না; বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের অসীলা মনে করত *(যুমার ৩৯/৩)*।[৮৬]

---

৮৬. পুরা আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: দ্র: তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৫৩-৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩১৪। তবে বর্ণিত আলোচনার সবটাকেই অকাট্য সত্য বলা যাবে

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের গোত্রে হাযার হাযার নবীর আগমন সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে। একইভাবে যদি ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার না থাকে, তবে একদিন মুসলিমদের হাতেই ইসলামের চূড়ান্ত ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যে মুসলিম দেশ সমূহের অভ্যন্তরে দুনিয়াপূজারী ধর্মনেতাদের হাত দিয়ে পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শিরকের রমরমা বাজার চলছে।

(২) শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হ'লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা'ল মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায়।

(৩) সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আঃ) একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

(৪) মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের কোন প্রভাব জীবিত ব্যক্তিদের উপরে পড়ে না। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশপাশে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান সহ বিগত যুগের শত শত জলীলুল ক্বদর নবীর কবর থাকা সত্ত্বেও তাদের বুকের উপরে সংঘটিত বা'ল দেবমূর্তি পূজার ব্যাপারে তাদের কোন প্রভাব তাদের স্বগোত্রীয় বনু ইস্রাঈলদের উপরে পড়েনি।

(৫) সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সবাইকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়। যেমন ইসরাঈলে যোগ্য লোক না থাকায় আল্লাহ পাক জর্ডান থেকে ইলিয়াসকে পাঠান তাদের হেদায়াতের জন্য।

না। কেননা এগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনা। যাতে ভুল তথ্য থাকতে পারে। কেবল কুরআনী বর্ণনাটুকুই আমাদের নিকট নিশ্চিতভাবে গ্রহণীয়। -লেখক।

২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে এই নবী সম্পর্কে সূরা আন‘আম ৮৬ ও সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নবীগণের নামের সাথে। সূরা আন‘আম ৮৩ হ’তে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা‘ সহ ১৭ জন নবীর নামের শেষদিকে বলা হয়েছে-

وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطاً وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ- (الأنعام ٨٦)-

‘ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘, ইউনুস, লূত্ব তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ *(আন‘আম ৬/৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ- (ص ٤٨)- ‘আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘ ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*। উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল-ইয়াসা‘ (আঃ) নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন।

তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরে আল-ইয়াসা‘ নবী হন এবং তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর শরী‘আত অনুযায়ী[৮৭] ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁর নাম ‘ইলিশা ইবনে সাকিত’ বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৮৮]

---

৮৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪ পৃঃ।*
৮৮. *তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৭০।*

২১. হযরত যুল-কিফ্ল *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে যুল-কিফলের নাম এসেছে। তিনি আল-ইয়াসা‘-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ- وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (الأنبياء ٨٥-٨٦)-

‘আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী’। ‘আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ- (ص ٤٨)- ‘আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘ ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*।

ইবনু কাছীর বলেন, শ্রেষ্ঠ নবীগণের সাথে একত্রে বর্ণিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, যুল-কিফল একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন’। সুলায়মান পরবর্তী নবী হিসাবে তিনিও শাম অঞ্চলে প্রেরিত হন বলে নিশ্চিত ধারণা হয়।

ইবনু জারীর তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পূর্বতন নবী আল-ইয়াসা‘ বার্ধক্যে উপনীত হ’লে একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাথীকে একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করব। গুণ তিনটি এই যে, তিনি হবেন (১) সর্বদা ছিয়াম পালনকারী (২) আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণকারী এবং (৩) তিনি কোন অবস্থায় রাগান্বিত হন না।

এ ঘোষণা শোনার পর সমাবেশ স্থল থেকে ঈছ বিন ইসহাক্ব বংশের জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। সে নবীর প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াবে হাঁ বললেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশ আহ্বান করলেন এবং সকলের সম্মুখে পূর্বোক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সবাই চুপ রইল, কেবল ঐ একজন ব্যক্তিই উঠে দাঁড়ালেন। তখন আল-ইয়াসা‘ (আঃ) উক্ত ব্যক্তিকেই তাঁর খলীফা নিযুক্ত করলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নবুঅতী মিশন চালিয়ে নিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত রাখবেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিই হ’লেন ‘যুল-কিফল’ (দায়িত্ব বহনকারী), পরবর্তীতে আল্লাহ যাকে নবুঅত দানে ধন্য করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা :

‘যুল-কিফল’ উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তার বাহিনীকে বলল, যেকোন মূল্যে তার পদস্খলন ঘটাতেই হবে। কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার তাকে ধোঁকা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। তখন ইবলীস স্বয়ং এ দায়িত্ব নিল।

যুল-কিফল সারা রাত্রি ছালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কেবলমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। ইবলীস তাকে রাগানোর জন্য ঐ সময়টাকেই বেছে নিল। একদিন সে ঠিক দুপুরে তার নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া নাড়লো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি একজন বৃদ্ধ মযলূম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে বসলো এবং তার উপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল। এভাবে দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিল। যুল-কিফল তাকে বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার উপরে যুলুমের বিচার করে দেব’।

যুল-কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে এলো না। পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে এলো না। কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর

এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না। তখন লোকটি ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়'। এইসব কথাবার্তার মধ্যে ঐদিন দুপুরের ঘুম মাটি হ'ল।

তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি ঢুলতে ঢুলতে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমি ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে। বৃদ্ধ এদিন এলো এবং কড়া নাড়তে চাইল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করল। এতে যুল-কিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহ'লে আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমি আজ আপনার কাছে ব্যর্থ হ'লাম। আপনাকে রাগানোর জন্যই গত তিনদিন যাবত আপনাকে ঘুমানোর সময় এসে জ্বালাতন করছি। কিন্তু আপনি রাগান্বিত হলেন না। ফলে আপনাকে আমার জালে আটকাতে পারলাম না। ইতিপূর্বে আমার শিষ্যরা বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ব্যর্থ হ'লাম। আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল-ইয়াসা' নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি এতসব কাণ্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন'।

উক্ত ঘটনার কারণেই তাঁকে 'যুল-কিফল' (ذو الكفـــل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি।[৮৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। বরং মৌলিক শর্ত হ'ল- তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।

(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।

---

৮৯. *তাফসীর কুরতুবী ও ইবনু কাছীর, সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ গৃহীত: ইবনু জারীর; হাদীছ মুরসাল; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১০-১১ পৃঃ।*

(৩) ধৈর্যগুণ হ’ল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও ছবর একত্রিত হ’লে মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।

(৪) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।

(৫) শয়তানের শয়তানী ধরে ফেলাটা মুমিনের সুক্ষ্মদর্শিতার অন্যতম লক্ষণ। অতএব কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন চিন্তা ও পরামর্শ সম্মুখে উপস্থিত হ’লেই বুঝে নিতে হবে যে, এটি শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

সংশয় নিরসন :

যুল-কিফল একজন নবী ও একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁকে নবীদের সাথেই দু’স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

(১) সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ- (الأنبياء ٨٥-٨٦)-

‘আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল, সকলেই ছিল ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত’। ‘আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)*।

(ক) উক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي- ‘পূর্বাপর সম্পর্কে এটা স্পষ্ট যে, নবীগণের তালিকায় নবী ব্যতীত অন্যদের নাম যুক্ত হয় না। তবে অন্যেরা কেউ বলেছেন, তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, কেউ বলেছেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। ইবনু জারীর এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন’।

(খ) কুরতুবী এখানে যুল-কিফল সম্পর্কিত আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) এবং হাকীম তিরমিযী (মৃঃ ৩৬০হিঃ) বর্ণিত দু’টি যঈফ হাদীছ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। জামে‘ তিরমিযী (হা/২৪৯৬)-তে এসেছে আল-কিফল (الكفل) এবং হাকীম তিরমিযী-র কিতাব *‘নাওয়াদিরুল উছূল’*-য়ে এসেছে

'যুল-কিফল' (ذو الكفل)। দু'টিই ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে *(তাহকীক কুরতুবী হা/৪৩৫২-৫৩)*। ইবনু কাছীর বলেন, তিরমিযীর হাদীছটি 'হাসান' বলা হ'লেও সেখানে 'আল-কিফল' বলা হয়েছে, যিনি কুরআনে বর্ণিত নবী 'যুল-কিফল' নন। বরং অন্য ব্যক্তি' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আম্বিয়া ৮৫; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৮৩)*।

(গ) সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত যঈফ হাদীছের উপরে ভিত্তি করেই ইমাম শাওকানী মন্তব্য করেছেন, الصحيح أنه رجل من بني إسرائيل، كان لا يتورع عن شيئ من المعاصي فتاب فغفر الله له، ليس نبي، وقال جماعة هو نبي– 'সঠিক কথা এই যে, তিনি বনু ইস্রাঈলের একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি কোন পাপের কাজে দ্বিধা করতেন না। পরে তিনি তওবা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করেন। তিনি নবী নন। তবে একদল বলেছেন যে, তিনি নবী' *(ফাৎহুল ক্বাদীর, তাফসীর সূরা আম্বিয়া ৮৫)*।

(ঘ) কুরতুবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আরেকটি হাদীছ এনেছেন যে, إن ذا الكفل لم يكن نبيًا ولكنه عبدا صالحًا 'নিশ্চয়ই যুল-কিফল নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন সৎকর্মশীল বান্দা ছিলেন'। অথচ ইবনু জারীর বর্ণিত উক্ত হাদীছটির অবস্থা এই যে, لا أصل له في المرفوع بل موقوف ضعيف أخرجه الطبري وهو منقطع– 'এর মরফূ' হওয়ার অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি মওকূফ, অর্থাৎ আবু মূসার নিজস্ব উক্তি। অথচ যার সূত্র যঈফ এবং যা ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে মুনক্বাতি' অর্থাৎ ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(তাহকীক কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৫)*।

(২) <u>সূরা ছোয়াদ</u> ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফল সম্পর্কে। আর তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*।

(ক) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন, أي ممن أختير للنبوة অর্থাৎ তারা ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নবুঅতের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ৪৮)*।

(খ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাওকানী স্বীয় তাফসীরে বলেন, أَهُم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله– ‘তারা হ’লেন সেই সকল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্র পথে বহু কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন’ অত:পর وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, الذين اختارهم الله لنبوّته واصطفاهم من خلقه ‘যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় নবুঅতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের মধ্য হ’তে বাছাই করে নিয়েছেন’। অত:পর এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم؛ ليسلك مسلكهم في الصبر– ‘আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তিনি ঐ সকল নবীদের কথা স্মরণ করেন, যাতে আল্লাহ্র পথে ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে তিনি তাদের অনুসৃত পথে চলতে পারেন।’

অথচ ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরে তিনি যুল-কিফলকে নবী বলেননি।

(গ) আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক মুফাসসির আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী স্বীয় *‘আয়সারুত তাফাসীরে’* সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরের টীকায় লিখেছেন, وأرجح الأقوال ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صـــ أنه قال: ‘সব কথার সেরা কথা হ’ল যা বর্ণনা করেছেন আবূ মূসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে’- বলেই তিনি পূর্বে বর্ণিত যঈফ হাদীছটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে *(অর্থাৎ তিনি নবী ছিলেন না)*। অথচ সূরা ছোয়াদ ৪৮-এর আলোচনায় ৩০ হ’তে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত দাঊদ (আঃ) হ’তে যুল-কিফল পর্যন্ত সকলকে তিনি নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য হ’ল, কুরআন যখন ইসমাঈল, ইদরীস, আল-ইয়াসা‘ প্রমুখ নবীগণের সাথে যুল-কিফলের নাম একসাথে বর্ণনা করেছে, তখন তিনি যে ‘নবী’ ছিলেন, এ বিশ্বাসই রাখতে হবে। এর বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া *(আলাইহিমাস সালাম)*

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সুলায়মান পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী নবী ঈসা (আঃ)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। তিনি ঈসার ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।[৯০] হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সম্পর্কে ৪টি সূরার ২২টি আয়াতে[৯১] বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আন'আমে কেবল ১৮জন নবীর নামের তালিকায় তাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। বাকী অন্য সূরাগুলিতে খুবই সংক্ষেপে কেবল ইয়াহ্ইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে।

যাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানে যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى 'এই কন্যার মত কোন পুত্রই নেই' *(আলে-ইমরান ৩/৩৬)*।

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ ঐসময় মারিয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হ'তে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে

৯০. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০।*
৯১. *যথাক্রমে (১) সূরা আলে-ইমরান ৩/৩৭-৪১=৫; (২) আন'আম ৬/৮৫, (৩) মারিয়াম ১৯/২-১৫=১৪; এবং (৪) সূরা আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০। মোট ২২টি ॥*

মারিয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তাঁর শেষনবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ- (آل عمران ٤٤)-

‘(মারিয়ামের বিষয়টি) হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল’ *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*। ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

মারিয়াম মসজিদের সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, هُوَ مِنْ عِنـــدِ اللهِ ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো‘আ :

সম্ভবতঃ শিশু মারিয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার মনের কোণে আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারিয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ- (آل عمران ٣٨)-

‘সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী’ *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। একথাটি অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে-

كهيعص- ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا- إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا- قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا- يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا- (مريم ٢-٦)-

‘এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি’*(মারিয়াম ২)*। ‘যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে মস্তক শ্বেত-শুভ্র হয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি’। ‘আমি ভয় করি আমার পরবর্তী বংশধরের। অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন’। ‘সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূব-বংশের এবং হে প্রভু! আপনি তাকে করুন সদা-সন্তুষ্ট’ *(মারিয়াম ১৯/২-৬)*।

জবাবে আল্লাহ বললেন,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا- قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا- قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا- قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا- فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا- (مريم ٧-١١)-

‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারু নামকরণ করিনি’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত’। ‘তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না’। ‘অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল’ *(মারিয়াম ১৯/৭-১১)*।

ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহ বলেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـــى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوْراً وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- (آل عمران ٣٩)-

‘অতঃপর যখন সে কামরায় ছালাতরত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, যে, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে। (১) যিনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে। (২) যিনি নেতা হবেন এবং (৩) যিনি নারীসঙ্গ মুক্ত হবেন ও (৪) সৎকর্মশীল নবী হবেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৯)*। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ মতে যাকারিয়া তিনদিন যাবৎ লোকদের সাথে কথা বন্ধ রাখলেন ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত এবং সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকলেন ও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন *(আলে ইমরান ৩/৪০-৪১)*। যাকারিয়ার প্রার্থনা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَّرَهَباً وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِينَ- (الأنبياء ٨٩-٩٠)-

‘এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে আহ্বান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি ‘আমাকে (উত্তরাধিকারীহীন) একা ছেড়ো না! তুমি তো (ইলম ও নবুঅতের) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী’। ‘অতঃপর আমরা তার দো‘আ কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)*।

অতঃপর ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا- وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا- وَبَرّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا- وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ١٢-١٥)-

‘হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা তাকে (৫) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম’*(মারিয়াম ১২)*। ‘এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে (৬) বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও (৭) পবিত্রতা এবং সে ছিল (৮) অতীব তাক্বওয়াশীল’*(১৩)*। ‘সে ছিল (৯) পিতা-মাতার অনুগত এবং (১০) সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না’*(১৪)*। ‘তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে’ *(মারিয়াম ১৯/১২-১৫)*।

উপরে বর্ণিত আলে-ইমরান ৩৯ ও মারিয়াম ১২-১৫ আয়াতে ইয়াহইয়া (আঃ)-কে প্রদত্ত মোট ১০ টি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ থেকে যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়। যেমন-

(১) যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে বসবাস করেন এবং তাঁরা বনু ইস্রাঈল বংশের নবী ছিলেন।

(২) যাকারিয়া (আঃ) বিবি মারিয়ামের অভিভাবক ও লালন-পালনকারী ছিলেন।

(৩) যাকারিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভ হ’তে একমাত্র পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং আল্লাহ স্বয়ং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া, যে নাম ইতিপূর্বে কারু জন্য রাখা হয়নি।

(৪) ইয়াহইয়া নবী হন। তিনি শৈশব থেকেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল হৃদয় ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার অতীব অনুগত এবং আল্লাহভীরু ছিলেন।

(৫) মারিয়াম ছিলেন ইয়াহইয়ার খালাতো বোন এবং ইয়াহইয়ার পরেই মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) নবী এবং রাসূল হন। তারপর থেকে শেষনবীর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ থাকে। যাকে فترة الرسل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়।

(৬) যাকারিয়া (আঃ)-এর শরী‘আতে ছিয়াম অবস্থায় সর্বদা মৌন থাকা এবং ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত কারু সাথে কথা না বলার বিধান ছিল। ইসলামী শরী‘আতে এটা রহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, لاَيُتْمَ بعد احتلامٍ ولا صُمَاتَ يومٍ الى الليل ‘অর্থাৎ সন্তান বালেগ হওয়ার পরে পিতৃহারা হ’লে তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না এবং রাত্রি পর্যন্ত সারা দিন মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়’।[৯২]

উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের চরিত্র পরে এতই কলুষিত ও উদ্ধত হয় যে, তারা যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার ন্যায় মহান পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হযরত ঈসাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেন।[৯৩]

ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু :

যাকারিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জনৈকা নষ্টা মহিলার প্ররোচনায় শাম দেশের বাদশাহ নবী ইয়াহইয়াকে হত্যা করলে ঐ রাতেই বাদশাহ সপরিবারে নিজ প্রাসাদসহ ভূমিধ্বসের গযবে ধ্বংস হয়ে যান। এতে লোকেরা হযরত যাকারিয়াকেই

৯২. *আবুদাঊদ হা/২৮৭৩ ‘অছিয়ত সমূহ’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*
৯৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদাহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৭-৫০; রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০-১১।*

দায়ী করে ও তাকে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করে। তখন একটি গাছ ফাঁক হয়ে তাঁকে আশ্রয় দেয়। পরে শয়তানের প্ররোচনায় লোকেরা ঐ গাছটি করাতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলে এবং এভাবেই যাকারিয়া নিহত হন বলে যাকারিয়া (আঃ) নিজেই মে'রাজ রজনীতে শেষনবী (ছাঃ)-এর সাথে বর্ণনা করেছেন বলে ইবনু আব্বাস-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعــه منكر– 'এটি বিস্ময়করভাবে পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও আশ্চর্যজনক হাদীছ এবং এটি রাসূল থেকে বর্ণিত হওয়াটা একেবারেই অমূলক।[৯৪] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, গাছের ফাটলে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলেন শা'ইয়া (شــــعيا)। আর যাকারিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।[৯৫] মানছূরপুরী বাইবেলের বর্ণনার আলোকে বলেন, ইয়াহ্ইয়াকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু বাদশাহ্র প্রেমিকা ঐ নষ্টা মহিলা তার মাথা দাবী করায় জেলখানায় তাকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত এনে ঐ মহিলাকে উপহার দেওয়া হয়।[৯৬]

অতএব উক্ত দুই নবীর মৃত্যুর সঠিক ঘটনার বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৯৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৫০।*
৯৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৮।*
৯৬. *রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১১ পৃঃ।*

২৪. হযরত ঈসা *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فتـــرة الرســـل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে ‘আল্লাহ্র পুত্র’ *(তওবাহ ৯/৩০)* বানিয়েছে’। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি ‘আল্লাহ’ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ’লেন তিন আল্লাহ্র একজন (ثَالِثُ ثَلَثَةٍ *=মায়েদাহ ৭৩)*। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)*। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় ৯৮টি আয়াতে[৯৭] বর্ণিত হয়েছে।

---

৯৭. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) আলে-ইমরান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; (৩) নিসা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) মায়েদাহ ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪, ৭৮, ১১০-১১৮=৯; (৫) আন‘আম ৬/৮৫; (৬) তওবা ৯/৩০-৩১; (৭) মারিয়াম ১৯/১৬-৪০=২৫; (৮) আম্বিয়া ২১/৯১; (৯) মুমিনূন ২৩/৫০; (১০) আহযাব ৩২/৭; (১১) শূরা ৪২/১৩; (১২) যুখরুফ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) হাদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছফ ৬১/৬, ১৪; (১৫) তাহরীম ৬৬/১২। সর্বমোট = ৯৮টি ॥*

ঈসার মা ও নানী :

ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তাঁর মা ও নানীর আলোচনা আগেই করে নিতে হয়। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরী'আতে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। এসব উৎসর্গীত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ'ত না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি'? *(আলে ইমরান ৩৬)*। অর্থাৎ একে দিয়ে তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি উক্ত কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্তুতঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنةِ خديجةُ بنتِ خُوَيْلِدٍ وفاطمةُ بنتِ محمدٍ ومريمُ بنتِ عمرانَ وآسيةُ بنتِ مُزَاحِمَ امرأةُ فرعونَ، رواه أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضـ

'জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ'লেন চারজন: খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাউনের স্ত্রী'।[৯৮]

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন :

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا

৯৮. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৮।*

وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَــذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (آل عمران ٣٥-٣٧)-

‘যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে। অতএব আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আলে ইমরান ৩৫)*। ‘অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম ‘মারিয়াম’। (মারিয়ামের মা দো‘আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে’ *(৩৬)*। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (অতঃপর ঘটনা হ’ল এই যে,) যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? মারিয়াম বলত, ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ’ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন :

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا- (مريم ١٦-٢١)-

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ'তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল' *(মারিয়াম ১৬)*। 'অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' *(১৭)*। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও' *(১৮)*। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব' *(১৯)*। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই' *(২০)*। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন

ও আমাদের পক্ষ হ’তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়’ *(মারিয়াম ১৯/১৬-২১)*। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ’ল *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*। অন্য আয়াতে একে ‘আল্লাহ্র কলেমা’ (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) অর্থাৎ ‘কুন্’ (হও) বলা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا- (مريم ٢٢-٢٦)-

‘অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল’ *(মারিয়াম ২২)*। ‘এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম’ *(২৩)*। ‘এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন’ *(২৪)*। ‘আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে’ *(২৫)*। ‘তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্র জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না’ *(মারিয়াম ১৯/২২-২৬)*।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন শরী‘আতে সম্ভবতঃ ছিয়াম পালনের সাথে অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কেও সন্তান প্রদানের নিদর্শন হিসাবে তিন দিন ছিয়ামের সাথে মৌনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঐ অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে

কথা বলার অবকাশ ছিল *(মারিয়াম ১৯/১০-১১)*। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল *(মারিয়াম ১৯/২৬)*।

আলোচনা :

(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন 'নেফাস' অর্থাৎ রজঃস্রাব হ'তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন। অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ট হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং অলৌকিক। আর এটা আল্লাহ্র জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তাঁরই এখতিয়ার। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- (آل عمران ٥٩-٦٠)-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল'। 'যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহ্র উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের ক্বিবলা বানিয়েছে।[৯৯]

---

৯৯. *ঈসার জন্মের স্থানটিকে এখন Bethlehem (بيت لحم) বলা হয়। যা উত্তর কুদ্স থেকে ৮ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত এবং ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের দখলীভুক্ত।- লেখক ॥*

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-mas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী *(৫৮৬-৬৩২ হিঃ)*-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم ٢٧-٢٨)-

‘অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ’ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ’। ‘হে হারূণের বোন![১০০] তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না’ *(মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)*। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহ্র দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْـــدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ٢٩-٣٣)-

‘অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব’? *(মারিয়াম ২৯)*। ঈসা তখন বলে উঠল, ‘আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন’ *(৩০)*। ‘আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে’ *(৩১)*। ‘এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি’ *(৩২)*। ‘আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব’ *(মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)*।

---

১০০. *মারিয়ামের এক ইবাদতগুযার ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ। অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কারণেও এটা বলা হ’তে পারে (কুরতুবী)।*

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- وَإِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- (مريم ٣٤-٣٦)-

‘ইনিই হ’লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা। আর ওটাই হ’ল সত্যকথা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে’ *(মারিয়াম ৩৪)*। ‘আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’)। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়’ *(৩৫)*। ‘ঈসা আরও বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ’ল সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)*।

কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ’তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ’লেও অনেকে পারেনি। তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের ঐসব বাক-বিতণ্ডার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ- (مريم ٣٧-٣٨)-

‘অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল (দুনিয়াতে যার শেষ হবে না)। অতএব ক্বিয়ামতের মহাদিবস আগমন কালে অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস’। ‘সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে’ *(মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)*।

মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য :

আল্লাহ পাক নিজেই মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- (التحريم ١٢)-

'তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ'তে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহ্র মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব *(আলে ইমরান ৩/৪২)*।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও সিজদাকারিনী *(ঐ, ৩/৪৩)*।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ্র আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন 'মারিয়াম' *(আলে ইমরান ৩/৩৬)*। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে এবং আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৩) মারিয়াম আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ’ত *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহ্র হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ’তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহ্র একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

---

১০১. *বুখারী, হা/২৪৮২ ‘মাযালিম’ অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ।*

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)*। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন *(তাহরীম ৬৬/১২)*। যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা হয়নি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে 'ছিদ্দীক্বাহ' অর্থাৎ কথায় ও কর্মে 'সত্যবাদীনী' আখ্যা দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৫/৭৫)*। যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি।

ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী *(আলে ইমরান ৩/৪৬ প্রভৃতি)*। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মুক্ত ছিলেন *(ঐ, ৩/৩৬-৩৭)*। (৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন *(মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান ৩/৪৬)*। (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৪৯)* এবং শেষনবী 'আহমাদ'-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন *(ছফ ৬১/৬)*। (৭) তাঁর মো'জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে *(আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০)*।

(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন *(আলে ইমরান ৩/৫০)*। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার

হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)*। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি’ *(নিসা ৪/১৫৭)*। (১০) তিনিই একমাত্র নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শূকর প্রভৃতি ধ্বংস করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[১০২]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী :

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

ঈসা (আঃ) নবুঅত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَـــدُ– ‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি **(১)** আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে **(২)** আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং **(৩)** আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম হবে আহমাদ’... *(ছফ ৬১/৬)*। তিনি বললেন, وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُـــدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ‘**(৪)** নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৬)*।

---

১০২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫, ঐ, ‘ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২।*

Contents

তিনি বললেন, وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ- (آل عمران ٥٠)-
'আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, **(৫)** আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর **(৬)** আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব **(৭)** তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- (النساء ١٦٠-١٦١)-

'বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল **(১)** আল্লাহ্র পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে'। 'এবং এ কারণে যে, **(২)** তারা সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, **(৩)** তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৬০-১৬১)*। তিনি আরও বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- (الأنعام ١٤٦)-

'এবং ইহুদীদের জন্য আমরা **(১)** প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং **(২)** ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী' *(আন'আম ৬/১৪৬)*।

ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন :

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইস্রাঈলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ- (آل عمران ٤٩)-

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) **(১)** আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। **(২)** আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং **(৩)** ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। **(৪)** আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। **(৫)** আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মো‘জেযা দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মো‘জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো‘জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ঈসা (আঃ)-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’লেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে ‘জাদুকর’ বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هَـــذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ- (المائدة ١١٠)- ‘যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়’ *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

উক্ত অপবাদে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহ্র কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ :

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ইহুদী কাফিরদের উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلاً- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيْماً- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَـكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْناً- بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً- (النساء ١٥٥-١٥٨)-

‘তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল (১) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, (২) অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং (৩) তাদের এই উক্তির কারণে যে, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন’... *(নিসা ১৫৫)*। ‘আর (৪) তাদের কুফরীর কারণে এবং (৫) মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে’ *(১৫৬)*। ‘আর তাদের (৬) একথার কারণে যে, ‘আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি’ *(১৫৭)*। ‘বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হ’লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)*।

ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ :

সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে ইহুদীদের ইপর আল্লাহ্র গযব নাযিলের ও তাদের অভিশপ্ত হওয়ার যে কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার (২) আল্লাহ্র পথে বাধা দান (৩) সূদী লেনদেন (৪) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৬) নবীগণকে হত্যা করা (৭) আল্লাহ্র পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন (৮) কুফরী করা (৯) মারিয়ামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী করা।

ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন :

তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্‌র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, 'এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি' *(নিসা ৪/১৫৭)*। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল ।

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তাঁর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

আল্লাহ্‌র পাঁচটি অঙ্গীকার :

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক'টিই তিনি পূর্ণ করেন। (১) হত্যার মাধ্যমে নয় বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ- (آل عمران ٥٥)-

‘আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব’ *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مُتَوَفِّيْكَ অর্থ ‘আমি তোমাকে ওফাত দিব’। ‘ওফাত’ অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে ‘ওফাত’ বলা হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا– ‘আল্লাহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে’ *(যুমার ৩৯/৪২)*। সেকারণ যাহহাক, ফাররা প্রমুখ বিদ্বানগণ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। এখানে বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যা কুরআনের বহু স্থানে হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বৈ কি! পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে,

ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[১০৩]

‘হাওয়ারী’ কারা?

حَوَارِىٌّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে ‘হাওয়ারী’ বলা হ’ত। কেউ বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (القصار)। ঈসার খাঁটি অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন। পরে তারা ঐ নামেই পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি ‘হাওয়ারী’ ছিল যে, তারা সর্বদা সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন ‘হাওয়ারী’ বলা হয়; শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি ‘ছাহাবী’ বলা হয়। আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ’লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে ‘ছাহাবী’ বলা হয় না। কেননা এই পরিভাষাটি কেবল ঐসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ‘হাওয়ারী’ শব্দটি কোন কোন সময় শুধু ‘সাহায্যকারী’ বা আন্তরিক বন্ধু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, ‘প্রত্যেক নবীর একজন ‘হাওয়ারী’ অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে। তেমনি আমার ‘হাওয়ারী’ হ’ল যুবায়ের’।[১০৪]

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

---

১০৩. *আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*

১০৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০১ ‘মানাক্বিব’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ٥٢-٥٣)-

‘যখন ঈসা বনু ইস্রাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্র পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ *(আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)*

অন্যত্র এসেছে এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوْا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ- (الصف ١٤)-

‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ *(ছফ ৬১/১৪)*।

অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেমন তিনি বলেন,

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ- (المائدة ١١١)-

'আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী' *(মায়েদাহ ৫/১১১)*। এখানে হাওয়ারীদের নিকট 'অহি' করা অর্থ তাদের হৃদয়ে বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা। এটা নবুঅতের 'অহি' নয়।

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু'দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে 'আল্লাহ' বলে। একদল তাঁকে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলে এবং একদল তাকে 'আল্লাহ্র দাস ও রাসূল' বলে। প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ'ল' বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন।

আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ :

মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- قَالُوْا نُرِيْدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ- قَالَ اللهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- (المائدة ١١٢-١١٥)-

'যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ১১২)*। 'তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব' *(১১৩)*। 'তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ'তে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রূযী দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(১১৪)*। 'আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না' *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিযীর একটি হাদীছে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা আসমান হ'তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। কিন্তু লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।[১০৫]

---

১০৫. আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১, 'তাফসীর' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'ন্যায় কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ-২২।

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন :

ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (المائدة ١١٦-١١٨)-

‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত’ *(মায়েদাহ ১১৬)*। ‘আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্তুতঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত’ *(১১৭)*। ‘এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ’ *(মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)*।

উপরোক্ত ১১৭নং আয়াতে বর্ণিত فَلَمَّا تَـــوَفَّيْتَنِيْ বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তাঁর ঊর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ কথোপকথনটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের পর দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে।[১০৬]

ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ জানতে পারি। যেমন-

(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী হিসাবে। অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী ‘আহমাদ’ বা মুহাম্মাদ-এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ’ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত উত্তরসুরী। নামধারী খৃষ্টানরা নয়।

(২) মু‘জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র রহমত আবশ্যক। যেমন ঈসা (আঃ)-কে যে মু‘জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু‘জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জন্মটাই ছিল এক জীবন্ত মু‘জেযা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি।

---

১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ক্বিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ-৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭, ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫।

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা (আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ প্রশ্নমালা ॥

১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আঃ)

প্রশ্ন (১৪-১৫/১) : কুরআন মাজীদে কোন্ নবীর আলোচনা সর্বাধিক স্থানে এসেছে এবং কেন? (উত্তর পৃ: ৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২) : কওমে মূসা ও ফেরাঊনের আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কত জায়গায় এসেছে? (উত্তর পৃ: ১০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩) : ফেরাঊনের পরিচয় কি? মূসার ফেরাঊন কয়জন ছিলেন? তাদের নাম কি? (উত্তর পৃ: ১০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪) : ডুবে মরা ফেরাঊনের লাশ কবে কোথায় পাওয়া যায়? তা এখন কোথায় সংরক্ষিত আছে? (উত্তর পৃ: ১০-১১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫) : ফেরাউনের আলোচনা কুরআন মাজীদে বেশী হওয়ার কারণ কি? (উত্তর পৃ: ১১-১২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬) : বনু ইস্রাঈল মূলতঃ কার বংশধর? কুরআনে তাদের উক্ত নামে অভিহিত করার কারণ কি? (উত্তর পৃ: ১২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭) : প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত অধিকাংশ নবীগণের আবাসস্থল কোথায় ছিল? (উত্তর পৃ: ১২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮) : বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান কোথায়? (উত্তর পৃ: ১২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯) : মূসা ও হারূণ ইউসুফ (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১০) : হাকসূসগণ কখন মিসর শাসন করেন? তাদের শাসনামল কতদিন স্থায়ী ছিল? (উত্তর পৃ: ১২-১৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১১) : ইয়াকূবের মিসর আগমন ও মূসার প্রস্থানের মধ্যে কত বছরের ব্যবধান ছিল? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১২) : মূসার পরিচয় কি? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৩) : তিনি কোথায় কিভাবে ও কত বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন? (উত্তর পৃ: ১৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৪) : হারূণ (আঃ) মূসার কত বছরের বড় ছিলেন? তিনি কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ: ১৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৫) : মূসা (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৩-১৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৬) : মূসা (আঃ) কোথায় কোথায় জীবন কাটান ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন এবং কোথায় তার কবর হয়? (উত্তর পৃ: ১৪-১৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৭) : অধিকাংশ নবী নূহ (আঃ)-এর কোন পুত্রের বংশধর ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৮) : ফেরাঊন কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১৯) : ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার আদেশ দেন কেন? (উত্তর পৃ: ১৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২০) : হারূণ (আঃ) কিভাবে হত্যা থেকে বেঁচে যান? (উত্তর পৃ: ১৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২১) : মূসার মাকে আল্লাহ কি বলে অভয় দেন? (উত্তর পৃ: ১৬-১৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২২) : মূসা (আঃ) কিভাবে বেঁচে যান ও কোথায় কিভাবে লালিত-পালিত হন? (উত্তর পৃ: ১৭-১৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৩) : মূসা (আঃ) কিভাবে মাতৃক্রোড়ে ফিরে এলেন? (উত্তর পৃ: ১৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৪) : মূসা (আঃ) ক্বিবতীকে মারলেন কেন? (উত্তর পৃ: ২০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৫) : মূসা (আঃ) কি কি পরীক্ষার সম্মুখীন হন? (উত্তর পৃ: ২১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৬) : 'মাদইয়ান' কোথায় অবস্থিত? (উত্তর পৃ: ২২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৭) : মূসা (আঃ)-এর মাদিয়ানে হিজরতের মধ্যে আমাদের জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ২২ দ্র:)।

Contents

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৮) : মাদিয়ানে পৌঁছে মূসা (আঃ) কার কাছে আশ্রয় লাভ করেন? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৯) : মূসা (আঃ) কাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর বিবাহের মোহরানা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩০) : সর্বাধিক দূরদর্শী তিনজন ব্যক্তি কে কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ২৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩১) : মূসা (আঃ) কখন মিসর যাত্রা করেন? (উত্তর পৃ: ২৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩২) : মূসা (আঃ)-এর পথ হারিয়ে তূর পাহাড়ে পৌছনোর তাৎপর্য কী? সেখানে গিয়ে তিনি কোথায় দাঁড়ালেন? (উত্তর পৃ: ২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৩) : তিনি তূর পাহাড়ে গিয়ে কি দেখলেন? (উত্তর পৃ: ২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৪) : তিনি কিভাবে নবুঅত পেলেন? (উত্তর পৃ:২৫-২৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৫) : ঐ সময় মূসাকে প্রদত্ত দু'টি মু'জেযা ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ২৬-২৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৬) : মিসরে প্রদর্শিত নয়টি নিদর্শন ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ২৭-২৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৭) : মূসা (আঃ) যে পাঁচটি দো'আ করেছিলেন, সেগুলি ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ৩০-৩৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৮) : মূসা (আঃ) কিভাবে কালীমুল্লাহ হ'লেন? (উত্তর পৃ: ৩৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৯) : ফেরাঊন ও তার সভাসদগণকে আল্লাহ কি নামে অভিহিত করেছেন? (উত্তর পৃ: ৩৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪০) : ফেরাঊনের কাছে প্রেরণের সময় মুসাকে আল্লাহ কি বলে অভয় দেন? (উত্তর পৃ: ৩৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪১) : মূসা (আঃ) ফেরাঊনকে কি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ৩৪-৩৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪২) : দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৬ দ্র:)।

Contents

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৩) : উক্ত দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৪) : ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে 'কাফের' বললেন কেন? (উত্তর পৃ: ৩৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৫) : মূসার লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালু দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ: ৩৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৬) : জাদু ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য কি? (উত্তর পৃ: ৩৮-৩৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৭) : ফেরাঊনের অবস্থান কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৯-৪০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৮) : ফেরাঊনের জবাবের সার-সংক্ষেপ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৪০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৯) : মূসার মুকাবিলায় রশি নিক্ষেপের সময় জাদুকররা কিসের শপথ করেছিল? (উত্তর পৃ: ৪২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫০) : পরাজয়ের পর জাদুকররা কি করল এবং ফেরাঊন জনগণের উদ্দেশ্যে কি ভাষণ দিল? (উত্তর পৃ: ৪৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫১) : ফেরাঊনের ছয়টি কূটচাল কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৪৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫২) : জাদুকররা সত্যগ্রহণের পর ফেরাঊনের হুমকির জবাবে তারা কি বলেছিল? (উত্তর পৃ: ৪৫-৪৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৩) : জাদুকরদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৪৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৪) : জাদুকরদের উত্তম পরিণতিতে বিদ্বানগণ কি মন্তব্য করেছেন? (উত্তর পৃ: ৪৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৫) : আসিয়ার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৪৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৬) : দৃষ্টান্ত হিসাবে কুরআনে বর্ণিত চারজন নারী কে কে? (উত্তর পৃ: ৪৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৭) : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন নারী কে কে? (উত্তর পৃ: ৪৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৮) : বনু ইস্রাঈলের উপর ফেরাঊনী যুলুমসমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ৫০, ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৯) : মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে কি উপদেশ দেন? (উত্তর পৃ: ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬০) : বনু ইস্রাঈলদের ক্বিবলা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬১) : মূসা (আঃ) ফেরাঊন ও তার কওমের জন্য কি বদ দো'আ করেন? (উত্তর পৃ: ৫৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬২) : যুলুম সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে হিজরতের নির্দেশ না দেওয়ার কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৩) : ফেরাঊনী আচরণ থেকে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ৫৪-৫৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৪) : ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের প্রতি কি কি গযব আপতিত হয়? গযবের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৫) : মিসরে প্রদর্শিত নিদর্শন সমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ৫৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৬) : মিসরে বনু ইস্রাঈলের লোকসংখ্যা কত ছিল? (উত্তর পৃ: ৬৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৭) : মূসা সাগরডুবি থেকে কোন তারিখ মুক্তি পেয়েছিলেন? এ দিনটি কি নামে এবং কেন এত প্রসিদ্ধ? (উত্তর পৃ: ৬৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৮) : ফেরাঊনের বাহিনীকে ডুবিয়ে মারার কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৬৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৯) : ফেরাঊন ও তার বাহিনীর ধ্বংসের পর মূসা (আঃ) মিসরে গিয়ে সিংহাসন দখল করলেন না কেন? (উত্তর পৃ: ৭০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭০) : নাজাত লাভের পর বনু ইস্রাঈল কোথায় গিয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৭১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭১) : বনু ইস্রাঈলগণ নাজাত লাভের পর মূর্তিপূজার আবদার করল কেন? (উত্তর পৃ: ৭১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৬) : মান্না ও সালওয়া কি বস্তু? (উত্তর পৃ: ৯২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৭) : কিভাবে তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের বন্দীত্বের অবসান ঘটে? (উত্তর পৃ: ৯৪-৯৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৮) : বনু ইস্রাঈলকে পার্শ্ববর্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম কেন দেওয়া হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৯৪-৯৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৯) : হিত্ত্বাহ ও হিন্ত্বাহ অর্থ কি? এ শব্দ দু'টি কিসের প্রমাণ বহন করে? (উত্তর পৃ: ৯৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯০) : বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি? (উত্তর পৃ: ৯৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯১) : কিভাবে তাওরাত পরিবর্তন করা হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৯৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯২) : বনু ইস্রাঈলের প্রতি গাভী কুরবানীর নির্দেশ দানের কারণ কি? (উত্তর পৃ: ৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৩) : গাভী কুরবানীর ঘটনায় কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ৯৯-১০০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৪) : বনু ইস্রাঈলের উপর চিরস্থায়ী গযবের প্রকৃতি কি? (উত্তর পৃ: ১০০-১০১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৫) : মূসা ও খিযিরের ঘটনার প্রেক্ষাপট কি? (উত্তর পৃ: ১০২-১০৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৬) : খিযির-এর কর্মসমূহের তাৎপর্য কি? (উত্তর পৃ: ১০৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৭) : এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি ? (উত্তর পৃ: ১০৬-১০৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৮) : খিযির কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১০৭-১০৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৯) : মূসা ও ফেরাউনের ঘটনায় কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১১০-১১১ দ্র:)।

১৬. হযরত ইউনুস (আঃ)

প্রশ্ন (১৬/১) : ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/২) : ইউনুস (আঃ-এর পুরা নাম কি? তাকে কুরআনে কোথায় কি কি নামে অভিহিত করা হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৩) : ইউনুস (আঃ) কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৪) : ইউনুস (আঃ) কেন মাছের পেটে গেলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৩-১১৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৫) : তিনি কত সময় মাছের পেটে ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৬) : তিনি কিভাবে মাছের পেট হ'তে মুক্তি পান? (উত্তর পৃঃ ১১৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৭) : দো'আয়ে ইউনুস কি? তা কুরআনের কোন সূরায় কত নং আয়াতে রয়েছে? এর ফযীলত কি? (উত্তর পৃঃ ১১৬-১৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৮) : মাছের পেট থেকে বের হয়ে প্রথম তিনি কি খান? (উত্তর পৃঃ ১১৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৯) : তাঁর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১৮ দ্রঃ)।

১৭. হযরত দাঊদ (আঃ)

প্রশ্ন (১৭/১) : দাঊদ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? তার বয়স কত ছিল? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/২) : দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৩) : তিনি শেষনবী (ছাঃ)-এর কত বছর পূর্বেকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৪) : মূসার পরে কোন নবীর নেতৃত্বে ফিলিস্তীন বিজিত হয়? (উত্তর পৃঃ ১২০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৫) : আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রধান দু'টি যোগ্যতা কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১২১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৬) : বনু ইস্রাঈল তালূতকে নেতা হিসাবে কিভাবে মানতে বাধ্য হ'ল? (উত্তর পৃ: ১২১-১২২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/৭) : তালূত পথিমধ্যে তার সৈন্যদের কি পরীক্ষা নেন এবং তাতে কতজন উত্তীর্ণ হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১২২-১২৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/৮) : যুদ্ধে দাঊদ কিভাবে জালূতকে পরাস্ত করেন? (উত্তর পৃ: ১২৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/৯) : তালূতের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি? (উত্তর পৃ: ১২৪-১২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১০) : দাঊদ (আঃ)-এর কতটি পুত্র সন্তান ছিল? তন্মধ্যে কে নবী হয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ১২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১১) : দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১২৬-১৩০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১২) : তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৩০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১৩) : দাঊদের কওমের লোকেরা বানর ও শূকরের পরিণতি বরণ করেছিল কেন? (উত্তর পৃ: ১৩৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১৪) : তাদের মধ্যে কয়টি দল হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৩৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১৫) : সর্বযুগে হকপন্থীদের করণীয় কি? (উত্তর পৃ: ১৩৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১৬) : আল্লাহ্‌র গযবে আকৃতি পরিবর্তিতদের বংশধারা থাকে কি? (উত্তর পৃ: ১৩৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : দাঊদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃ: ১৩৭ দ্র:)।

১৮. হযরত সুলায়মান (আঃ)

প্রশ্ন (১৮/১) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং কোন এলাকার নবী ছিলেন? তিনি কত বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন? (উত্তর পৃ: ১৩৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/২) : সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৩৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৩) : বাল্যকালে সুলায়মান (আঃ)-এর প্রজ্ঞা কিরূপ ছিল? এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনা দু'টি কি? (উত্তর পৃ: ১৩৮-৩৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৪) : সুলায়মান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৩৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৫) : তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কয়টি? (উত্তর পৃ: ১৪৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৬) : হুদহুদ পাখির পরিচয় কি? সুলায়মান (আঃ) বিশেষ করে তাকে কেন খোঁজ করলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৭-১৪৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৭) : হুদহুদ পাখি বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে কি প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি জওয়াবে কি বলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৮) : বিলক্বীস কোন রাজ্যের রাণী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৯) : রাণী বিলক্বীসের কাহিনী কুরআনের কোন স্থানে কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১০) : বিলক্বীসের সিংহাসন উঠিয়ে আনা ও স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১১) : সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল কি? (উত্তর পৃ: ১৫৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১২) : হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে কোন শহরে ও কি উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৫৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৩) : বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রথম কার মাধ্যমে কখন ও কোথায় নির্মিত হয়? (উত্তর পৃ: ১৫৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৪) : সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস কিভাবে পুনর্নির্মিত হয়? (উত্তর পৃ: ১৫৯-১৬০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৫) : তিনি কখন কিভাবে মৃত্যু বরণ করেন? (উত্তর পৃ: ১৫৯-১৬০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৬) : তাঁর মৃত্যু কাহিনীতে কি শিক্ষা রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৬০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৭) : সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বেঁচে ছিলেন এবং কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৬৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৯) : শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের কত বছর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃঃ ১৬৪ দ্রঃ)।

১৯. হযরত ইলিয়াস (আঃ)

প্রশ্ন (১৯/১) : ইলিয়াস (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/২) : ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমন কালে ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৩) : সুলায়মানের উত্তরসূরীদের অপকর্মের কারণে বনু ইস্রাঈল সাম্রাজ্য কয় ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সেগুলো কি কি? (উত্তর পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৪) : তাঁর সময় 'ইস্রাঈল'-এর শাসনকর্তার নাম কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৫) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম কোন মূর্তির পূজা করত? (উত্তর পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৬) : ইলিয়াস (আঃ) তাঁর কওমকে কি বিষয় দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃঃ ১৬৬ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৭) : তাঁর দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ১৬৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৮) : আল্লাহ ও বা'ল দেবতার নামে কোথায় কুরবানী হয়েছিল? তার ফলাফল কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৬৭-১৬৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৯) : ইলিয়াস (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? (উত্তর পৃঃ ১৬৮-১৬৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/১০) : বা'ল দেবতার পরিচয় কি? বা'লা বাক্কা বর্তমানে কোথায় অবস্থিত? (উত্তর পৃঃ ১৬৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৯/১১) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কাহিনীতে কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১৭০ দ্রঃ)।

২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ)

প্রশ্ন (২০/১) : আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২০/২) : আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৭১ দ্রঃ)।

২১. হযরত যুল-কিফ্‌ল (আঃ)

প্রশ্ন (২১/১) : যুল-কিফ্‌ল (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/২) : তিনি কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৭২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/৩) : যুল-কিফ্‌ল (আঃ) জীবনে কি পরীক্ষার সম্মুখীন হন? (উত্তর পৃ: ১৭৩-১৭৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/৪) : যুল-কিফলের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃ: ১৭৪-১৭৫ দ্রঃ)।

২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ)

প্রশ্ন (২২-২৩/১) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া কোন এলাকার অধিবাসী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/২) : ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে সম্পর্ক কি? (উত্তর পৃ: ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৩) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরার কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৪) : মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে মনোনীত হন? (উত্তর পৃ: ১৭৮-১৭৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৫) : যাকারিয়া (আঃ) কখন সন্তান লাভে উদ্বুদ্ধ হন? (উত্তর পৃ: ১৭৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৬) : যাকারিয়া (আঃ)-এর দো‘আ কবুলের নিদর্শন কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৮০-৮১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৭) : ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ১৮১-৮২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৮) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কি কি? (উত্তর পৃ: ১৮২-১৮৩ দ্র:)।

২৪. হযরত ঈসা (আঃ)

প্রশ্ন (২৪/১) : ঈসা (আঃ)-কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২) : কোন সময়কে 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৩) : ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৪) : ঈসা (আঃ)-এর মা ও নানী কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৮৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৫) : মারিয়ামের মা কি মানত করেছিলেন এবং তিনি কিভাবে লালিত-পালিত হন? (উত্তর পৃ: ১৮৬-৮৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৬) : মারিয়ামকে লালন-পালনের জন্য সকলে প্রত্যাশী ছিল কেন এবং কে তাকে প্রতিপালন করেন? (উত্তর পৃ: ১৮৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৭) : ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও লালন-পালন কিভাবে হয়? এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা কি? (উত্তর পৃ: ১৮৮-৯০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৮) : 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের ন্যায়' -এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? (উত্তর পৃ: ১৯০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৯) : ২৫ ডিসেম্বর ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস পালন ভিত্তিহীন হওয়ার পিছনে দলীল কি? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১০) : মারিয়ামকে খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়ার নির্দেশ দানের পিছনে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১১) : মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১২) : মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৩) : মারিয়ামের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪-১৯৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৪) : ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৬-১৯৭ দ্র:)।

Contents

প্রশ্ন (২৪/১৫) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৭-১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৬) : প্রধানতঃ কি কি কারণে কোন কোন বস্তু ইহুদীদের উপরে হারাম করা হয়, যা পূর্বে হালাল ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৭) : ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৮) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২০০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৯) : ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ২০১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২০) : ঈসা (আঃ)-কে শত্রুরা হত্যা করতে পেরেছিল কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২১) : ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার কি কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২২) : 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'-এর অর্থ কি? (উত্তর পৃ: ২০৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৩) : ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ কি এবং তারা কারা? (উত্তর পৃ: ২০৩-২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : 'হাওয়ারী' কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? (উত্তর পৃ: ২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৫) : হাওয়ারীদের নিকট অহী করা বলতে কি বুঝায়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৬) : ঊর্ধ্বারোহণের পর ঈসায়ীগণ কয় দলে বিভক্ত হয়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৭) : 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৮) : ঈসা (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৯-২১০ দ্র:)।